" প্র থ ম অ ধ্যা য় "

কোচবিহার রাজ্য ও কোচ রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

আলোচ্য বিষয়ের সূত্র-সংক্ষেপ —

[কোচ কথাটির উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা —— কোচবিহার রাজ্য ও কোচ-রাজ বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ —— রাজন্য বর্গ এবং প্রজা সাধারণের ধর্ম ও সংস্কৃতি —— আঞ্চলিক ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষা —— কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে (বর্তমানে উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে) সাহিত্যসভা গ্রন্থাগারে এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত পান্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা প্রস্তুতি এবং বিন্যাস।]

ষোড়শ শতকে পশ্চিম কামরূপে বা কামতায় কোচশক্তির উদ্ভব উত্তরপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কামরূপ এবং কামতার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কোচ রাজন্যবর্গ এবং জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান কম্বেশী কিছু আছে। অতএব রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু বলার আগে 'কোচ'দের সম্পর্কে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'কোচ'দের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় — (ক) কোচ কারা ? এবং (খ) 'কোচ' কথাটি কি ভাবে এসেছে ?

প্রথম প্রশ্নটির নির্ভুল উত্তর দেবার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা হচ্ছে তথ্যের অপ্রতুলতা এবং যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর পারস্পরিক বিরোধিতা। অথচ 'কোচ'দের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে সুধীজনরা নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক — উভয় দিক থেকেই অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু সংশয় রহিত উত্তর কিছু পাওয়া যায়নি। মতৈক্যের চেয়ে মতানৈক্যই প্রবলতর হয়ে উঠেছে। বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি অভিমত তুলে ধরছি :—

হার্বার্ট রিজলীর মতে —(১)

" A comparison of these opinions (অর্থাৎ ডাল্টন্, ওল্ডহ্যাম্ প্রভৃতির অভিমত) with my own observations and with the average cephalic, nasal and naso - malar indices of the caste ascertained by a large number of actual measurements seems to me to warrant the conclusion that the Kochh, Rajbansi, Paliya, Desi and other varieties by whatever names they are called, are ~~da~~ descended from a Dravidian stock, which may probably have occupied the valley of the Ganges at the time of the Aryan advance into Bengal. Driven forward by the incursion into the swamps and forests of northern and north - eastern Bengal, the tribe were here and there brought into contact with the Mongoloid races of the Lower Himalayas and of the Assam border, and their type may have been affected to a varying degree by intermixture with these people. But on the whole Dravidian characteristics predominate among them over the Mongolian "

রিজলীর এই অভিমতকে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেন নি। কারণ —(১)

" দ্রাবিড় কোনও নরগোষ্ঠীর নাম নয়, এমন কি জনের নামও নয়, ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগের অন্যতম নাম মাত্র। ......

রিজলী কথিত মোঙ্গলীয় প্রভাব সম্বন্ধে প্রথমেই বলিতে হয়, বাংলার ও ভারতের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলী প্রত্যন্ত দেশগুলির সকল ভোট - চীনিক গোষ্ঠীর লোকেরাই মোঙ্গলীয়-আকৃতি নয়। ...... আর্যদের ভারতাগমনের পূর্বে, আর্যভাষা বিস্তৃতি [illegible] লাভের আগে বাংলা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর পর্যন্ত

মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, ইতিহাসে এমন কোনও প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘ করোটি কোচ, পালিয়া, বা উত্তর বাংলার বাহে, রাজ বংশী প্রভৃতি ভোট - চীনিক গোষ্ঠীর লোকেরা হিমালয় অঞ্চল বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে আসিয়া ঐতিহাসিক যুগেই উপনিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়ত, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এইসব মোঙ্গলীয় বেশির ভাগই দীর্ঘমুণ্ড।"

মোঙ্গলীয় – দ্রাবিড় সাংকর্যের মতকে অগ্রাহ্য করে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় কোচদের সম্পর্কে লিখলেন –(৩)

" বহু দিন আগে রমা প্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়া ছিলেন এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাহা সমর্থন করিয়া ছিলেন যে, এই কাম্বোজেরা (দিনাজপুর জেলার বানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিতে যার উল্লেখ আছে) তিব্বত, ভোটান প্রভৃতি হিমালয়ের মানুষদের কোন মোঙ্গলীয় জনের শাখা এবং বর্তমান উত্তরবঙ্গের কোচ – পলিয়া – রাজ বংশীদের পূর্ব পুরুষ। সুনীতি বাবু কাম্বোজের সঙ্গে 'কোচ' শব্দের একটা শব্দতাত্বিক যোগও অনুমান করিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি এইমত এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন জানিনা।"

আচার্য সুনীতি কুমার 'কিরাত - জন - কৃতি'তে উত্তরবঙ্গের কোচ'দের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কোচ-মেচ - গারো প্রভৃতি জনেরা সকলেই সুবিশাল 'বোড়ো' জাতির বিভিন্ন শাখা। ভোট - চীনীয় ভাষাবর্গের অন্তর্গত 'ভোটব্রহ্ম' ভাষাভাষী এই গোষ্ঠী খ্রীষ্টপূর্ব এক সহস্রাব্দ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং উত্তর - পূর্ব ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বসতি স্থাপন করে। এদের যে শাখাটি কামরূপের পশ্চিমাঞ্চলে — কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর এবং পূর্ববঙ্গের কিছু অংশে বসতি স্থাপন এবং হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারাই পরবর্তী কালে কোচ - মেচ - হাজং - পালিয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। (৪)

প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ গ্রিয়ারসনও প্রায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ——

"There can be little doubt that the original Kochs were the same as Bodos. The name Koch, in fact, connotes a Hinduised Bodo who has abandoned his ancestral religion for Hinduism and ancestral Bodo language for Bengali or Assamese. Those Koch who are now Hindus, are princ*pally known under the name Rajbansi." (২)

বোড়ো থেকে কোচ এবং কোচ থেকে রাজবংশী নামে আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি বর্তমানে বিতর্কিত বিষয় বলে চিহ্নিত। কিন্তু আচার্য সুনীতি কুমার তাঁর 'কিরাতজনকৃতি' (পৃঃ ১১১) গ্রন্থে, ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর 'Rajbansis of North Bengal' (পৃঃ ১০) গ্রন্থে বিষয়টিকেই সমর্থন করেছেন।

তবে 'কোচ'রা সুবিশাল 'বোড়ো' জাতির শাখা হলেও তাদের রক্তে মিশ্রণ ঘটেছে।

"The masses of the North Bengal areas are very largely of Bodo origin, of ~~mixed~~ mixed Austric - Dravidian - Mongoloid, where groups of peoples from lower Bengal and Bihar have penetrated among them." (৩)

দ্রাবিড় - মোঙ্গলীয় সাংকর্য না ঘটলেও অস্ট্রিক - মোঙ্গলীয় সাংকর্য যে ঘটেছিল সে সম্পর্কে মতানৈক্য খুবই কম।

সূচনাতেই বলেছি সংশয় রহিত উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। একালের গবেষকরাও ~~xxxx~~ সঠিকে পৌঁছতে পারেন নি। ডঃ রেবতী মোহন সাহা তাঁর গবেষনা গ্রন্থে ("বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে কোচ রাভা ভাষা") কোচ ও রাভাদের অভিন্ন বলে দাবী করেছেন। আবার শ্রীরা চরণ নারজিনারি "In search of Identity — The Mech" পুস্তকে বলেছেন —

"It is high time for the Koch - Rajbansis to examine themselves and return to their original tribe -- the Mech or Bodo." (৭)

ডঃ সাহার দাবী ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে, আর শ্রী নারজিনারির দাবী জনতত্ত্বের দিক থেকে। কিন্তু জনতত্ত্বই হোক আর ভাষাতত্ত্বই হোক, পূর্বোত্তর ভারতে বোড়ো জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের(যেমন - অস্ট্রিক) সংমিশ্রণ এত ব্যাপকভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে হয়ে এসেছে যে, উৎসে প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত দুরূহ বলেই মনে হয়।

প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আপাতত এই অভিমত দেয়া যায় যে, 'কোচ' রা ভোট - ব্রহ্মভাষাভাষী বোড়ো গোষ্ঠীরই একটি শাখা। তবে এদের রক্তে ও ভাষায় মিশ্রণ ঘটেছিল অনেক আগেই। এই মিশ্রণের তারতম্য অনুসারে কোথাও অস্ট্রিক, কোথাও বা মোঙ্গলীয় প্রভাব অধিকতর প্রকট। আর ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয় যে তারা বহুকাল আগেই আর্যভাষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের কথ্য ভাষাকে পরিত্যাগ করেছে।

'কোচ' কথাটির উৎস সম্বন্ধে খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ বলেন - (৮)

"পরশুরামের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণ ভগবতীর ক্রোড়ে (কোড়ে) আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই হইতে কোচ নামের উৎপত্তি, ক্ষত্রিয় জাতির সংকোচ অবস্থা হইতে কোচ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন সমুদ্রকোষ নদের তটবর্ত্তী বলিয়া কোষ হইতে কোচ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। জাতি কৌমুদী এবং যোগিনীতন্ত্রের লিখিত 'কুবাচ' (মন্দভাষী) শব্দ হইতেও কোচ নামের উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু যোগিনী তন্ত্রে 'কোষ' দেশের নাম আছে।"

এই সবই অনুমান মাত্র। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে শব্দটির উৎস নির্ণয়ের প্রয়াসে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —(৯)

The present day Bengali word is Kōc or rather Kōṃc, and this can well be from a Middle Indo Aryan source form Kawomca written Kamoca which could properly be sanskritised as Kamboja, as we noted before. A later sanskritisation of the non-nasalised form of the name koca occurs in Yogini-tantra as kuvaca. Another sanskritised form of the name Koca viz Kuvaca-ka is found in the "Padma-Purana."

'কম্বোজ' শব্দ থেকে কোচ শব্দের উৎপত্তির সম্ভাবনা আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। 'কুবাচক' শব্দ থেকে 'কোচ' শব্দের উৎপত্তি ভাষা-তাত্ত্বিক দিক থেকে হয়ত অধিকতর যুক্তি-সম্মত। তবুও একটি প্রশ্ন অনিবার্যভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়। সমৃদ্ধ আর্যভাষার তুলনায় পূর্বোক্ত ভারতের ভোট-ব্রহ্মভাষা-ভাষী সব গোষ্ঠীরই বাচক ভাষা 'কু-ভাষা'। কুবাচক বললে তাদের কেও বলতে হয়। তাহলে সুবৃহৎ বোড়ো জাতির একটি মাত্র গোষ্ঠী 'কুবাচ' বা 'কোচ' বলে আখ্যাত হবে কেন? শব্দটি 'ভোটব্রহ্ম' ভাষার কোনো মৌলিক শব্দও হতে পারে। তাছাড়া শব্দটি 'কোচ', কোঁচ, বা কোচা তাও চূড়ান্ত ভাবে জানা যায় নি। ভবিষ্যতে ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিচারে উন্নততর বিজ্ঞান-সম্মত গবেষনার দ্বারা প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

নৃতাত্ত্বিক অথবা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে 'কোচ'-রা যাই হোক না কেন, মধ্যযুগের কামতার ইতিহাসে কোচ রাজন্য বর্গের যে গৌরবময় ভূমিকা ছিল, তা অনস্বীকার্য। ষোড়শ শতকে পশ্চিম কামরূপে কোচশক্তির উদ্ভব প্রসঙ্গে আলোচনার সূচনাতে ভারী সুন্দর মন্তব্য করেছেন স্যার ই. এ. গেট — (১০)

"Perhaps the most interesting epoch in Assam history is that in which the Koch dynasty rose to power after defeating the petty chiefs amongst whom the country had been split up after the fall of the Pala rulers, succeeded in consolidating their rule through-out the ancient Kamrupa and in reviving the prestime glories of that once famous kingdom."

গেট্-এর এই মন্তব্য অত্যুক্তি নয় — বরং সংযত এবং সুচিন্তিত। পঞ্চদশ শতকের শেষলগ্নে অথবা ষোড়শ শতকের সূচনায় কামতায় (পশ্চিম কামরূপে) কোচ শক্তির অভ্যুত্থান শুধুমাত্র আসামের ইতিহাসের নয়, পূর্বোত্তর ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গৌড়ের হোসেনশাহী বংশের রাজত্বকালে এর উদ্ভব এবং বিস্ময়কর বিস্তার নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ ঘটনা। উত্তর কালে আগ্রাসী মুঘল এবং প্রতিবেশী (আহোম, ভোট প্রভৃতি) প্রভৃতি শক্তিগুলির চাপে এবং ধারাবাহিক সংকোচন ঘটলেও চারশ'র বেশী বছর ধরে এই রাজ্যটি নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল — তা সে স্বাধীন ভাবেই হোক, বা করদমিত্র রাজ্য রূপেই হোক।

এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের আক্রমণে ধনজন সমৃদ্ধ কামতা নগরী বিধ্বস্ত হয়। 'খেন' বংশের শেষ রাজা নীলাম্বর পরাজিত হয়ে কামতাপুর ত্যাগ করেন এবং স্বল্পকালের জন্য পশ্চিম কামরূপে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই 'খেন' রাও কোচদেরই একটি শাখা —

"A branch of the Kochs were undoubtedly the royal house of Khens or Khyans which was ruling in Kanarupa upto 1498 A.D., when Nilambar, their last king, was over-thrown by Hussain Shah of Bengal" (Kirata - Jana - Krti. (Revised Edition 1974) - p. 103)

হোসেন শাহ কামতা বিধ্বস্ত করে [redacted] সেনাবাহিনীর একাংশ দানিয়েলের অধীনে রেখে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। হোসেন শাহের প্রত্যাবর্তনের পর কামতার ভূঁইঞারা প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠেন। তাঁদেরই মিলিত আক্রমণে দানিয়েলের বাহিনী বিধ্বস্ত হয় এবং কামতায় মুসলিম শাসন স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। কিন্তু ভূঁইঞারা এরপর আত্মকলহে লিপ্ত হলে কামতায় অরাজকতা দেখা দেয়। সেই সুযোগে চিকনার (বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত) জনৈক হরিয়া বা হরিদাস মণ্ডলের পুত্র বিশু বা বিশ্ব শক্তিশালী কোচ জাতির সহায়তায় অত্যন্ত বিপুতার সঙ্গে আত্মকলহে লিপ্ত ভূঁইঞাদের পরাজিত বা নিহত করে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশু সিংহ নাম বা উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আসীন হন। বিশুর জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই -

বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত চিকনায় মেচ বংশীয় হরিয়া বা হরিদাস 'মণ্ডল' নির্বাচিত হন। হরিদাসের দুই স্ত্রী, হীরা ও জীরা, কোচ বংশীয়া ছিলেন। হীরার গর্ভে শিবের ঔরসে বা বরে বিশুর জন্ম হয়। খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা লিখেছেন —" কোচবিহার এবং দরঙ্গের বংশাবলীয় লিপিতে ইনি মহাদেবের ঔরস জাত বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন।" (কোচবিহারের ইতিহাস - প্রথম খণ্ড - পৃঃ ৮০)।

নিতান্ত কোচ - মেচের ঘরের যুবকের রাজ্যলাভের ঘটনাকে অলৌকিকরূপ দেবার প্রবণতা থেকেই হয়তো এ কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে।[১১] তবে শিবের বরে বিশুর জন্ম এমন কথা "আকবর - নামা"তেও লিখিত আছে। বিশু সিংহের সিংহাসনে আরোহণের কাল সম্বন্ধেও প্রবল বিতর্ক রয়েছে। এই কালসীমার এক কোটিতে

রয়েছে ১৪৯৬ খ্রীঃ , অপর কোটিতে ১৫৩০ খ্রীঃ । স্যর ই. এ. গেট বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশ্বসিংহের সিংহাসন আরোহনের কালকে ১৫১৫ খ্রীঃ ধরাই যুক্তিযুক্ত বলেছেন । বিশ্বসিংহ প্রথমে চিকনায় ছিলেন । পরে কামতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । 'রাজোপাখ্যানে' অবশ্য হিঙ্গুলাবাসে (বর্তমান আলিপুর দুয়ার মহকুমার মহাকালগুড়ির সন্নিহিত স্থান) রাজধানী স্থাপনের কথা বলা হয়েছে । চিকনার কাছে 'কিল্লা বিশ্বেশ সিংহের ধ্বংসাবশেষ আছে । বিশ্বসিংহের সমসাময়িক কবি পীতাম্বরের 'মার্কণ্ডেয়' পুরাণের ভনিতায় বলা হয়েছে —

"মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে ।" (পত্র সংখ্যা - ১ , পুঁথি নং - ৮)।

তবে এই কামতা নগর নীলাম্বরের রাজধানী কামতা নগর কি না বলা কঠিন । বার বার রাজধানী পরিবর্তনের কারণও নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি । যাই হোক , নব প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্যটির সীমা ছিল পশ্চিমে করতোয়া , পূর্বে ব্রহ্মপুত্র , উত্তরে ভুটান এবং দক্ষিণে রংপুর জেলার (বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত) গাইবান্ধা উপজেলার কাছাকাছি অঞ্চল পর্যন্ত । কোচ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রূপে মহারাজ বিশ্বসিংহ নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ । মহারাজ বিশ্বসিংহের পর সিংহাসনে বসেন মহারাজের প্রথম পুত্র কুমার নরসিংহ । কিন্তু মহারাজের অপর দুই পুত্র মল্লদেব এবং শুক্লধ্বজের দ্বারা রাজ্যচ্যুত হয়ে তিনি ভুটানে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেন । সিংহাসনে আসীন হন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি মহারাজ নর নারায়ণ । নর-নারায়ণের সিংহাসন আরোহণের কাল সম্বন্ধেও মতপার্থক্য আছে । এরও এক কোটিতে রয়েছে ১৫২৮ খ্রীঃ , অপর কোটিতে ১৫৫৫ খ্রীঃ । খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা নর নারায়ণের শাসন কাল ১৫৩৩-৩৪ খ্রীঃ — ১৫৮৭ খ্রীঃ বলে উল্লেখ করেছেন । এর পর থেকে কোচবিহারের রাজাদের 'কাল' আমানত উল্লা সাহেব-নির্দেশিত কালপঞ্জী অনুসারেই লেখা হবে । নর নারায়ণের রাজত্ব কালেই কোচ-শক্তির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে । ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন - (১২)

"The new monarch soon proved himself 'not a chip of the old block but the block itself'. He not only imbibed the political administrative and military talents of his father but added to them a munificent patronage of Hindu religion and learning, and a refined taste for magnificent public works. He was great in peace and war and his reign ushers the golden age in the annals of the Koch Kingdom."

অনুজ শুক্লধ্বজের রণনিপুণতায় তিনি উত্তর পূর্ব ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়ে ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হলেও পশ্চিমে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেন নি। গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও, মুঘল শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে সদ্ভাব স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। দিল্লীশ্বর আকবরের দরবারে উপঢৌকন সহ প্রতিনিধি প্রেরণ তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। ষোড়শ শতকে পূর্বভারতে কোচশক্তি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। মহারাজ স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করেন এবং তাঁর সময় থেকেই কোচবিহারের রাজাদের নামের শেষে 'নারায়ণ' শব্দটি যুক্ত হতে থাকে। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, সুবিখ্যাত কামাখ্যা মন্দির পুনর্নির্মাণ, সুবংশে দশভুজার পূজা প্রবর্তন, বাণেশ্বর শিব স্থাপন, বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা মহারাজের স্মরণীয় কীর্তি। তবে মহারাজের শেষ জীবন শান্তিতে কাটেনি। সর্বনাশা জ্ঞাতি বিরোধের বীজ তাঁর সময়েই উপ্ত হয় এবং রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়।

মহারাজ নরনারায়ণের পর পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন কুমার লক্ষী নারায়ণ। লক্ষী নারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৮৭ খ্রীঃ — ১৬২৭ খ্রীঃ) জ্ঞাতিবিরোধ চরমে ওঠে। শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণ পূর্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পাঠান ভূঁইয়া ঈশাখাঁর সাহায্যে লক্ষী নারায়ণকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। লক্ষী নারায়ণ বাধ্য হয়ে তৎকালীন বাংলার সুবাদার এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুঘল সেনাপতি মানসিংহের

দুরবস্থ হন। মুঘল আনুকূল্য লাভ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অসুর রাজের সঙ্গে নিজ ভগিনী প্রভাবতীদেবীর বিবাহ দেন। কোচরাজ শক্তি সাময়িক ভাবে মুঘল ছত্র ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু শেষ পরিণতি শুভ হয়নি। পরবর্তী সুবাদার কাসেম খাঁর বিরোধিতায় কোচ-মুঘল দ্বন্দ্বের সূচনা হয় এবং লক্ষী নারায়ণকে কিছুকাল ঢাকায় বন্দী জীবন যাপন করতে হয়। অবশেষে বাদশাহের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন। লক্ষী নারায়ণ পিতৃতুল্য দূরদর্শী বা সমর কুশল ছিলেন না। তবুও তিনি অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করেন নি। সাহিত্য - সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন যুদ্ধের ঘনঘটায় ব্যতিব্যস্ত থেকেও।

মহারাজ লক্ষীনারায়ণের পর পুত্র ক্রমে রাজত্ব করেন মহারাজ বীর নারায়ণ (১৬২৭ খ্রীঃ — ১৬৩২ খ্রীঃ), মহারাজ প্রাণ নারায়ণ (১৬৩২ খ্রীঃ — ১৬৬৫ খ্রীঃ) এবং মহারাজ মোদনারায়ণ (১৬৬৫ খ্রীঃ — ১৬৮০ খ্রীঃ)। মোদনারায়ণ অপুত্রক থাকায় এই বংশে পুত্রক্রমে রাজা হওয়ার নিয়মের অবসান ঘটে। উল্লিখিত রাজাদের মধ্যে মহারাজ প্রাণ নারায়ণ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। বিদ্যোৎসাহী, কলানিপুণ এবং কূটকৌশলী প্রাণ নারায়ণ যুগপৎ আহোম এবং মুঘল আক্রমণের প্রতিরোধ করেছিলেন। মুঘল সেনাপতি মীর জুমলা কোচবিহারে আক্রমণ করেন। মহারাজ সুকৌশলে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মীর জুমলা আসাম জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রাণ নারায়ণ সহজেই স্বরাজ্য উদ্ধার করেন। মীর জুমলার পরবর্তী বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁকে বিপুল অর্থের দ্বারা সন্তুষ্ট করে রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। উত্তর কালে প্রতিবেশী আহোম ও নেপাল রাজের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে ছিলেন। মহারাজের ভগিনী রূপমতীদেবীর সঙ্গে নেপাল-রাজ প্রতাপমল্লের বিবাহ হয়। কামতার সুপ্রসিদ্ধ দেবী গোসানীর বর্তমান মন্দির নির্মাণ মহারাজের অন্যতম কীর্তি। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

মহারাজ মোদনারায়ণের পর যথাক্রমে বসুদেব নারায়ণ (১৬৮০ খ্রীঃ — ১৬৮২ খ্রীঃ)

মহীন্দ্র নারায়ণ (১৬৮২ খ্রীঃ – ১৬৯৩ খ্রীঃ), রূপ নারায়ণ (১৭০৪ খ্রীঃ – ১৭১৪ খ্রীঃ) উপেন্দ্র নারায়ণ (১৭১৪ খ্রীঃ – ১৭৬৩ খ্রীঃ), দেবেন্দ্র নারায়ণ (১৭৬৩ খ্রীঃ–১৭৬৫ খ্রীঃ), ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ (১৭৬৫ খ্রীঃ – ১৭৭০ খ্রীঃ), রাজেন্দ্র নারায়ণ(১৭৭০ খ্রীঃ–১৭৭২ খ্রীঃ), এবং ধরেন্দ্র নারায়ণ (১৭৭২ খ্রীঃ – ১৭৭৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। এই পর্বে জ্ঞাতি বিরোধ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, রাজহত্যা, নাজীর দেওয়ান সংঘর্ষ, ভুটিয়া – উপদ্রব চরমে ওঠে এবং রাজ্যের শান্তি বার বার বিঘ্নিত হয়। মহারাজ ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকাল কোচবিহারের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং রাজ্যের দেওয়ান রাম নারায়ণের সঙ্গে ভুটান রাজ দেব যধুরের অশুভ আঁতাত নিরসনের জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে স্বহস্তে রাজ প্রাসাদে হত্যা করেন। ক্ষুব্ধ দেবযধুর সুকৌশলে ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণকে বন্দী করে ভুটানের রাজধানী 'পুনাখা' (পুনাখা) নগরে প্রেরণ করেন। এর পর কোচ – ভোট সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। মহারাজ ধরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে ভুটিয়া আক্রমণে বিপন্ন 'কোচ রাজ্য' অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থী হয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ই এপ্রিলের সন্ধি অনুসারে কোচবিহার 'করদ - মিত্র' রাজ্যে পরিণত হয়। ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ মুক্ত হন। ধরেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের পুত্র। পিতা বন্দী হওয়ায় পুত্র রাজ্যভার গ্রহন করেছিলেন। কিন্তু পিতার মুক্তির অব্যবহিত পরে পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু হলে পুত্রশোক বক্ষে নিয়ে ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ আবার সিংহাসনে বসেন (১৭৭৫ খ্রীঃ – ১৭৮৩ খ্রীঃ)।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ পরলোক গমন করেন কুমার হরেন্দ্র নারায়ণ শৈশবাবস্থায় সিংহাসনে বসেন। রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহারাণী ও রাজমাতা কামতেশ্বরী। কিন্তু নাজীর খগেন্দ্র নারায়ণ এবং মহারাণীর উপদেষ্টা ও রাজগুরু গোস্বামীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সংঘর্ষে কোচবিহার সর্বস্বান্ত হয়। পুনরায় কোম্পানীর হস্তক্ষেপে অরাজকতার আপাত অবসান হয় এবং মহারাজের বয়ঃ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত রাজ্যের শাসনভার কোম্পানীর এক ইংরেজ কমিশনারের উপর অর্পিত হয়।

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্ব কালে (১৭৮৩ খ্রীঃ — ১৮৩৯) রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং সাহিত্য সাধনার সবিশেষ উন্নতি ঘটে। হরেন্দ্র নারায়ণের পর সিংহাসনে যথাক্রমে আসীন হন শিবেন্দ্র নারায়ণ (১৮৩৯ খ্রীঃ — ১৮৪৭ খ্রীঃ) এবং নরেন্দ্র নারায়ণ (১৮৪৭ খ্রীঃ — ১৮৬৩ খ্রীঃ)। মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ণের অকাল বিয়োগের পর শিশুপুত্র নৃপেন্দ্র নারায়ণ সিংহাসনে বসেন। রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ব্রিটিশ কমিশনারের উপর অর্পিত হয়। ১৮৮৩ খ্রীঃ নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্বহস্তে রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করেন। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্ব কালে (১৮৬৩ খ্রীঃ — ১৯১১ খ্রীঃ) কোচবিহারে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণই ছিলেন আধুনিক কোচবিহারের রূপকার। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহারের বর্তমান রাজ প্রাসাদটি নির্মিত হয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজ মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্নেহধন্য ছিলেন। মহারানীর আমন্ত্রণে তিনি ইংলণ্ড ভ্রমণ করেন। আধুনিক প্রথায় শহর নির্মাণ, স্কুল - কলেজ স্থাপন, রাস্তা রেল - যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন, সর্বোপরি কুপ্রথা ভেঙে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর পাণি গ্রহণ তাঁর রাজত্ব কালের উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। রাজ দেবালয় ' শ্রী শ্রী মদন মোহন ঠাকুর বাড়ী 'ও তাঁরই রাজত্ব কালে নির্মিত হয়েছিল।

মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের পর সিংহাসনে বসেন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ-রাজেন্দ্র নারায়ণ (১৯১১ খ্রীঃ — ১৯১৩ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁর অকাল বিয়োগ ঘটলে সিংহাসনে আসীন হন অনুজ জিতেন্দ্র নারায়ণ (১৯১৩ খ্রীঃ — ১৯২২ খ্রীঃ)। জিতেন্দ্র নারায়ণ ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ হয়ে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন। বরোদার রাজ কুমারী ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনিও ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণ পরলোক গমন করলে জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ মাত্র ৮ বৎসর বয়সে রাজা হন। রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে রিজেন্সি কাউন্সিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ্ও ছিলেন। রাজার হাট মহা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা মহারাজের প্রজাপ্রীতির

অন্যতম নিদর্শন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ভারত স্বাধীন হয়। জাতীয় সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মহারাজ সিংহাসন ত্যাগ করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাজ্য ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্বোত্তর ভারতে প্রায় ৪৪০ বৎসর স্থায়ী একটি হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে।

কেবল আয়তনিক বা প্রশাসনিক পরিবর্তনই নয়, রাজ্যটির নামও একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। ষোড়শ শতকে বিশ্বসিংহ-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির নাম ছিল কামতা। কিন্তু মহারাজ নর নারায়ণের সময় থেকেই রাজ্যটি 'বিহার', 'বেহার' নিজ বেহার' নামে অভিহিত হতে থাকে। মহারাজ প্রাণ নারায়ণও 'কামতেশ্বর' বলে অভিহিত হয়েছেন। 'কোচবিহারের ইতিহাস'-১ম খণ্ড থেকে জানা যায় যে রাল্‌ফ্ ফিচ্, স্টিফেন ক্যাসিলা প্রমুখ বিদেশী পর্যটকরা তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এ দেশের নাম 'কোচ' লিখেছেন। তারিখে ফেরিশ্তা, 'আকবর নামা', এবং তোজকে-জাহাঙ্গিরী পুস্তকে এই দেশের নাম কোচ লিখিত আছে। ....
ব্লেউ-এর মানচিত্রে (Blaev's Map. 1650) কামতা (Comtoy) রাজ্যের নাম আছে।" [১৩] রাজদপ্তরে কেবল বিহার নামটি আছে। অবশেষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ঘোষণা পত্রে রাজ্যের নাম 'কোচবিহার' করায় এই নাম-বিভ্রাটের অবসান ঘটে।

কোচ রাজ বংশের এবং কোচরাজ্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে অসংগতি ও অস্পষ্টতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার ভিতর থেকেও এই রাজ বংশের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যায় ——
প্রথমত, এই রাজ বংশ নিতান্ত অনভিজাত 'জন' থেকে উদ্ভূত। মহারাজ বিশ্বসিংহের 'অতীত' গৌরব-ময় কিছু ছিল না। কিন্তু কৌমজীবন থেকে আগত এই রাজ বংশের রাজারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণা করেছেন। দেবালয় প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার, তীর্থকৃত্য, ভূমিদান, শিক্ষাবিস্তার, সুকুমার শিল্পকলার চর্চা প্রায় উদ্ভব কাল থেকেই শুরু হয় এবং অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয়ত, অনভিজাত শ্রেণী - সম্ভূত হলেও এই রাজ বংশের রাজাদের রাজনৈতিক চিন্তা - চেতনা এবং আভিজাত্য বোধ সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে। মুঘল সম্রাট আকবর মহারাজ নর নারায়ণকে সৌজন্যমূলক স্বীকৃতি দিয়ে ছিলেন। অম্বুর রাজ মানসিংহ এই রাজ পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। নেপাল রাজমহিষীবৃন্দে রাণী বৃপমতী (মহারাজ প্রাণ নারায়ণের স্ত্রী) সবিশেষ খ্যাতি-সম্পন্না ছিলেন। উত্তরকালে বরোদা এবং জয়পুরের রাজবংশের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কেবল রাজ পরিবারের সঙ্গেই নয়, উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারের সঙ্গেও এই রাজ বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে ছিল। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের মহিষী [redacted] সুনীতিদেবী ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের কন্যা।

ইউরোপীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গেও এই রাজ বংশের পরিচয় ঘটেছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহধন্য মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ সম্রাজ্ঞীর আমন্ত্রণে সস্ত্রীক ইউরোপ ভ্রমণ করেন।

তৃতীয়ত, সমকালীন ভারতের ইতিহাস মনে রাখলে কোচরাজন্য বর্গের সামরিক কুশলতা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রশংসা করতেই হয়। সন্ধি ও বিগ্রহ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর প্রতিকূলতা এবং আগ্রাসী মুঘলের আস্ফালনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁরা কখনো অস্ত্রবলে, কখনো বা বুদ্ধিবলে স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সর্বনাশা জ্ঞাতিবিরোধ ঘুণপোকার মতো একে দুর্বল করে তোলায় এবং উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের লোভ ও বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে রাজ্যটি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজের ছত্র ছায়ায় যেতে বাধ্য হয়।

চতুর্থত, সমগ্র বঙ্গদেশ যখন মুসলমান পদানত তখন প্রান্ত-উত্তর-বঙ্গের এই রাজ্যটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য রূপে বহুকাল নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

রাজন্যবর্গ এবং প্রজা সাধারণের 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ মাত্র করা হবে।

148824

31 OCT 2002

কামতায় কোচশক্তির অভ্যুত্থানের আগে থেকেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর বসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের অনুশীলনও শুরু হয় চতুর্দশ - পঞ্চদশ শতকে। কাজেই অনায়াসে অনুমান করা যায় যে উদ্ভব-লগ্নে এ রাজ্যের জনগণের বৃহত্তম অংশ হিন্দুই ছিল। আর কোচ রাজ বংশে প্রবাহিত হয়েছে শৈব - শক্তি - বৈষ্ণব এমন কি ব্রাহ্মধর্মের ধারা। মহারাজ বিশ্বসিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন। মহারাজ নর নারায়ণ পঞ্চোপাসক হিন্দুর মতো শিব - শক্তি - বিষ্ণুর উপাসনা করেছেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ শঙ্করদেবের শিষ্য মাধব দেবের প্রচারিত ধর্মমতকে 'রাজধর্ম' রূপে স্বরাজ্যে গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মী নারায়ণের পুত্র বীর নারায়ণ জেলাতলার গ্রামে চতুর্ভুজ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। xxxx প্রায় সব রাজাই মঠ - মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন।

প্রজাপুঞ্জের বৃহত্তম অংশ যদিও হিন্দু, তবুও তাঁদের ধর্ম-কর্ম-পূজা-অর্চনা পুরোপুরি স্মৃতিশাসিত নয়। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নিজ নিজ কৌম চেতনাকে তারা পুরোপুরি বিসর্জন দেয়নি।

কামতায় কোচশক্তির অভ্যুত্থান ও বিকাশের অনেক আগে থেকেই কামরূপ তথা সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন 'জন'রা বসতি স্থাপন শুরু করে। তাঁদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। আবার বহু বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত এ অঞ্চলের উপর দিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হওয়ার ফলে, জন - সাংকর্যের মতো ভাষা -সাংকর্যও ঘটে। জনতত্ত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে পন্ডিতমন্ডলী যে সব বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, ভাষা-বিচারের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আপাত বিচারে ভাষা - সমস্যাটি তেমন কিছু জটিল বলে মনে হয় না। উদ্ভব কাল থেকেই এ রাজ্যের জনগণের বৃহত্তর অংশের কথ্যভাষা বাংলা বা বাংলারই একটি উপভাষা। আর লেখ্যভাষা বরাবরই সমকালীন বঙ্গের লেখ্যভাষার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলেছে।

মাতৃভাষা বা প্রথমভাষা বাংলা নয়, এমন তপশিলি উপজাতির মধ্যে রাভা - মেচ - গারো, মুণ্ডা এবং ওঁরাওঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুণ্ডারা আদি-অস্ট্রাল এবং এদের মাতৃভাষা মুণ্ডারি। ওরাওঁরা দ্রাবিড় ভাষা - গোষ্ঠীর উপজাতি, এদের মাতৃভাষা কুরুখ। আর রাভা - গারো - মেচ প্রভৃতির মাতৃভাষা ভোট - চীনীয় ভাষাবর্গের ভোট ব্রহ্মশাখার অন্তর্গত। তবে এই তপশিলি উপজাতিদের সকলেরই 'বাইরের ভাষা' বাংলারই একটি উপভাষা।

বাংলার যে উপভাষাটি এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা (এবং তপশিলি উপজাতিদের বাইরের ভাষা), স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন তার নাম দিয়ে ছিলেন 'রাজবংশী উপভাষা'। পরবর্তী কালে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে (অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব্ বেংগলী ল্যাংগুয়েজ) গ্রিয়ারসনের উপভাষা বিন্যাসকে পুনর্বিন্যস্ত করে এই অঞ্চলের উপভাষার নতুন নাম দিলেন 'কামরূপী' উপভাষা। তারপর থেকে এটি 'কামরূপী' নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপভাষা হিসেবে 'কামরূপী'র গুরুত্ব কম নয়।
প্রথমত, এটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।
দ্বিতীয়ত[১৪], "অস্ট্রিক প্রভাবিত ভোট-চীন উপাদান কামরূপী উপভাষায় অনেক আছে এবং সে সূত্রেই তা বাংলা ভাষার সম্পদ। বিভিন্ন বৃত্তিধারী অনুন্নত শ্রেণীর কর্মজীবীদের ভাষায়, গ্রাম ও নদীর নামে, গ্রাম্য নারীর ভাষায় এই আর্যেতর উপাদান প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। বস্তুতঃ এই উপভাষা একদিকে আধুনিক বাংলা ভাষাকে, অপরদিকে ভোট - চীন ভাষা গোষ্ঠীকে ধরে রেখেছে।"

তৃতীয়ত[১৫], "একদা উত্তর পূর্ব বঙ্গীয় উপভাষা হইতে কামরূপীয় উপভাষার সৃষ্টি এবং তাহার অসমীয়া ভাষায় উন্নয়ণ হইয়াছে।" রাজ-শাসনাধীন কোচবিহারের একদিকে প্রাক্-উত্তরবঙ্গ, অন্যদিকে আসাম। কাজেই এ রাজ্যের জনগণের বাচক ভাষার গুরুত্ব স্বাভাবতই কিছু বেশী। এই উপভাষার কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য নীচে দেয়া হলো —
(১) অপিনিহিতির ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সে জায়গায় শব্দের অপিনিহিত রূপের অব্যবহিত প্রাচীন রূপটিই ব্যবহৃত হয়।

উদা: (সং) অদ্য > (প্রা) অজ্জ > (প্রা. ও ম. বাংলা) আজি [কামরূপীতে রক্ষিত] আইজ [অপিনিহিতি, বঙ্গালী]। তবে — আজি / আইজ, কালি / কাইল, দুই রূপেরই প্রচলন আছে।

(২) আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত এবং প্রায়শ: শব্দের আদিতে স্থিত অ > আ হয়। উদা: সকাল > সাকাল, গলা > গালা। কখনো কখনো শব্দমধ্যস্থিত 'এ', 'আ' হয়। যেমন — সাহস > সাহাস।

(৩) আবার শব্দের আদিতে স্থিত আ অ হয় —উদা: গাছ > গছ বা গচ, পাখি > পখি, পকি। (গ্রাম নাম — পকি - রাখা।)

(৪) শব্দের আদিতে স্থিত 'র' - ধ্বনির বর্জন এবং স্বরবর্ণের সংরক্ষণ —
উদা: রাজা > আজা, রুদ্র > উদ্র।
বিপরীতটাও কখনো কখনো ঘটে। যেমন — আইন > রাইন।

(৫) আদ্যব্যঞ্জনে প্রায়ই মহাপ্রাণতা দেখা যায় — উদা: বাসা > ভাসা
তবে আদিতে স্থিত মহাপ্রাণ - ধ্বনি রক্ষিত হয় —
ঘর, ঝড়, ভাই কখনোই 'বঙ্গালী'র মতো গর, জর, বাই রূপে উচ্চারিত হয় না।

(৬) ধ্বনির বিস্তারণ —

চেংড়ী > চেহ্ংড়ী, পান > পাহান ইত্যাদি।

(৭) শ, ষ, স > শ রূপে উচ্চারিত হয়। অনুরূপ ভাবে র, ড়, ঢ় > র রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। উদা: আষাঢ় > আশাঢ়।

(৮) অর্ধসংবৃত 'অ' এবং 'এ' ধ্বনি শব্দের আদিতে 'অ্যা' রূপে উচ্চারিত হয়।
উদা: খর (খড়) > খ্যার, শেষ > শ্যাশ্।

(৯) 'ই' কিংবা 'উ' পরবর্তী ক্ষেত্রে 'আ' ধ্বনি 'অ্যা' রূপে উচ্চারিত হয়।
উদা: উষা > উষ্যা, ডিম্ব > ডিমা > ডিম্যা।

(১০) বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের একবচনে (ওঁ - , অঁ) বিভক্তি যুক্ত হয় ।
উদা: করোঁ , পারোঁ , করঅঁ ইত্যাদি । এ ছাড়াও — করঙ্ , খাঙ্ , দেখঙ্
প্রভৃতি রূপও প্রচলিত ।

(১১) গৌণ কর্মে ও সম্প্রদানে ' ক ' বিভক্তি ।
উদা: মোক , তোক , উয়াক , রামক ।
করণ কারকে - ত - বিভক্তি —
উদা: বঁড়শি বশিত ধরা যাচ (বঁড়শি দিয়ে ধরা যাচ্ছে)।
অপাদানে —' থাকি ' , হাতে ।
উদা: ঘর হাতে বির করি দে ।
সম্বন্ধে - র - বিভক্তি — ঘরর পাচৎ (ঘরের পেছনে) ।
অধিকরণে - ত - বা ' ৎ ' — যাতেৎ যাঁও (যেতে যাই) ।

(১২) বর্তমান কালের [illegible] অনুজ্ঞায় - ' এক ' - বিভক্তি যুক্ত হয় ।
উদা: হাটেক , করেক , চলেক ।

(১৩) সর্বনাম :

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	মুই	আমরা / আমরালা না
মধ্যম পুরুষ	তুই	তোমরা / তোমরালা না
প্রথম পুরুষ	ইয়াঁয় , উয়াঁয় , ওঁয়	ইমরালা না / ওমরালা না

' সে ' সর্বনামটির ব্যবহার দেখা যায় না ।

(১৪) নঞর্থক অব্যয়ের ক্রিয়ার - পূর্বে ব্যবহার —
না - যাঁও , না'দ (দাও না) ।
(১৫) কয়েকটি বিশিষ্ট অনুসর্গ — খায় , বাদে ইত্যাদি ।
উদা: যাওয়া খায় , করা খায় ।
তোর বাদে (তোর জন্য) ।

(১৬) - ইল -, ইব - প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের বিশেষণ রূপে ব্যবহার —
'জন্মিল্ ছাওয়া', 'দেখিল্ মানুষি', 'করিবা কাম' ইত্যাদি।

(১৭) অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো রূপে -'য়' নাও থাকতে পারে।
উদা: বাপ আসি (আসিয়া) - সতী শুনি (সব শুনিয়া) -
গাড়ি ধরি (গাড়ি ধরিয়া) হাটেং গেইল (হাটে গেল)।

(১৮) কিছু বিশিষ্ট শব্দ — থিং (চুপ করে বা স্থির হয়ে), য্যালা (যখন), এ্যালা (এখন), বাথি (বখারী), ঝীয়া (জবাব [illegible] অর্থে)।
উদা: মাউরীয়া (মাতৃহীন), মাউরীয়া (জবাবী) ইত্যাদি।

কামরূপী উপভাষা প্রায় উত্তর বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রচলিত ছিল এবং আছে। এর কতকগুলো বিভাষাও আছে। অঞ্চল ভেদে এর রূপও পরিবর্তিত হয়। নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ দ্বারা এই উপভাষার আরও কিছু কিছু অনন্য-সাধারণ বিশিষ্টতা খুঁজে পাওয়া খুবই সম্ভব। তবে সে দায়িত্ব ভাষাতত্ত্বের গবেষকের।

এবারে এ অঞ্চলের শিষ্টভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ভূমিকাতেই বলা হয়েছে যে, বহু বিচিত্র ভাষা - বিভাষা - উপভাষার স্রোত এ অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। সুদূর অতীতে এই ভূখণ্ড ছিল 'অস্ট্রিক' ভাষাভাষী জনের আবাস ভূমি ——

"অস্ট্রিক ভাষা এক সময় মধ্য ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সাঁওতাল ভূমি, আসাম, নিম্নব্রহ্ম, মালয়, আনাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল।" [১৬] অস্ট্রিক ছাড়াও দ্রাবিড় ভাষাভাষী কোনো কোনো গোষ্ঠী (যেমন ওঁরাও) আদিতে এখানে বসবাস করত। কিরাত সংস্কৃতির স্রষ্টা মোঙ্গলীয়রা এসেছে পরে। খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দের আগেই তিব্বতের পূর্বভাগের কোনো এক ভূখণ্ড থেকে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ভোট - চীনীয় ভাষাবর্গের 'ভোট - ব্রহ্মশাখার' জন'রা ভারতে প্রবেশ করে এবং সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও

পূর্ব হিমালয় অঞ্চল জুড়ে বসতি স্থাপন করে । এদের মধ্যে ' বোরো ' বা ' বড়ো ' - রাই সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার । এ অঞ্চলের জনগণের বৃহত্তর অংশ ' বোড়ো ' গোষ্ঠীরই লোক । কোচ - মেচ - গারো - রাভা - কছারী - মিরি - নাগা প্রভৃতি এই বৃহৎ বোড়ো গোষ্ঠীরই নানা শাখা - প্রশাখা ।

নবাগত ভোট ব্রহ্মভাষাভাষী এই বোরোদের সঙ্গে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী ' জনদে 'র কোনো সংঘর্ষ হয়েছিল কিনা , তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি । তবে মনে হয় যে , নবাগতদের সংখ্যা ও শক্তি-র আধিক্যে তারা ধীরে ধীরে এ অঞ্চল থেকে সরে যেতে থাকে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে ' অস্ট্রিকভাষা ' ভোট - চীনীয় ভাষাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে আত্ম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় । যেমন ঘটেছে ' খাসি 'দের ক্ষেত্রে । আবার নেপাল - তিব্বতকায় ভোট - চীনীয় ভাষা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করেছে অস্ট্রিকভাষাকে ।[১৫] কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে , অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা সরে গিয়েও বিজেতার ভাষাকে প্রভাবিত না করে ছাড়ে নি । ' মুণ্ডা 'দের Pronominalisa-tion বৈশিষ্ট্যটি নেপালী ভাষায় দেখা যায় । এ ছাড়া এ অঞ্চলের স্থান নামের শেষে - গুড়ি - , পাড়া - প্রভৃতি অনুসর্গ এবং ডোঙ্গা , ডিঙা , দলং , হলং প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রভাবের ফল । ভোট - ব্রহ্ম ভাষাভাষীদের সংস্কৃতি তেমন উন্নত ছিল না । অবশ্য ভোট ব্রহ্মভাষার বৈশিষ্ট্য ' অসমীয়া ' এবং 'কামরূপী 'র উপর কিছুটা পড়েছে সন্দেহ নেই । কিন্তু প্রকৃত উত্তর বঙ্গের লেখ্যভাষার উপর এর প্রভাব নেই বললেই চলে ।

কিরাত - ভাষা ও সংস্কৃতির পর এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রবাহ —— যা আর্যভাষা এবং আর্য সংস্কৃতি নামে পরিচিত । খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে বাংলায় আর্য ভাষাভাষীদের আগমণ শুরু হয় । আর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ এবং প্রাগ্ জ্যোতিষে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে । আর্য সংস্কৃতির প্রভাব সমাজের উচ্চস্তরে যতটা পড়েছিল , নিম্নস্তরে ততটা পড়েনি । যাই হোক , উত্তরবঙ্গ ও কামরূপে প্রবেশের পর আর্যভাষা (পূর্ব - মাগধী) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়

এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকেই সে পরিবর্তন লক্ষণীয় হয় । প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং (বা যুয়ান্ - চোয়াঙ্), সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ভারত - দর্শনে এসেছিলেন । তিনিও মধ্য ভারতের কথ্য ভাষার সঙ্গে কামরূপের কথ্য ভাষার কিছুটা পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন ।

এই পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —[১৬]

"Perhaps this 'differing a little' of the Kama-rupa speech from the speech of 'Mid-India' (and presumably also from those of Pundra-vardhana and other places in Bengal) refers to those modifications of Aryan sounds, which now characterise Assamese as well as North and East Bengali dialects e.g., ≪ts, s, dz, z≫ for ≪c, ch, j, jh≫ , ≪r≫ (rather than ≪ṛ≫) for ≪ḍ≫ , and ≪h≫ for ≪ś < s, ṣ, s≫ . The presence of a large Tibeto Burman element in the population of Assam and East and North Bengal may have something to do with this (cf. the Tibetan and Burmese pronunciation of IA. ≪c, ch, j [jh]≫ as ≪ts, ts-h, dz≫ and ≪ts [s] s-h, z≫ , and Burmese pronunciation of ≪s≫ as a spirant ≪th≫[θ]); and these phonetic modifications very likely were first brought about in the Magadhi Prakrit or Apabhransa dialect current in Kama-rupa, with its predominantly Tibeto-Burman population, as noticed by the observant Hiuen Thsang ; and from Kama-rupa the ≪ts, dz≫ , ≪r≫ , and ≪h≫ pronunciations might have spread into the contiguous tracts of Bengal --- where, however, they do not seem to have become regularly established in the way they have done in Assamese."

আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমশ: সমাজের নিম্নস্তরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং বাংলা ও আসামের অনেক উপজাতি আর্যভাষাভাষী হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্টীয় দশম — দ্বাদশ শতকের মধ্যেই প্রাচীন বাংলা সুগঠিত পূর্ণ ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন উপভাষা। যেমন — রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী এবং কামরূপী। উপভাষাগুলোর উদ্ভব প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —[১১]

"The Bengali dialects cannot be referred to a single primitive Bengali spe̸ch, but they are derived from various local forms of late Magadhi Apabhrans's, which developed some common characteristics that may be called pan-Bengali e.g. « ila - , - iba - » for the past and future base, rather than « -ala - , - aba - » ; « iā » rather than « i » for the conjunctive, « - era - -Kera » besides « - ara -Kara » for the genetive; « -ke , -- re » for the dative, rather than « -ku - » as in Oriya etc. These pan - Bengali fetures link the dialects together as members of a single group, and enabled them to be attached to a composite literary language as a matter of course."

আবার এই literary language বা সাধু ভাষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হচ্ছে —[১০]

"The literary language has all the pan Bengali characteristics, but some times it leans to one dialect and some-times to another, although its basis is "Gaudiya" or Typical West Central Bengali".

' চর্যাপদগুলি 'ই প্রাচীন বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন । নেপাল - রাজ দরবারে রক্ষিত চর্যার ' পাণ্ডুলিপি 'গুলির রচনা স্থল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে কিছু জানা যায় নি । ভাষাতত্ত্বের বিচারে —[২১]

"The language of the Caryas seems to be based on a West Bengal dialect. Some of its forms belong rather to West Bengal than to East Bengal."

কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন , ডঃ বাণীকান্ত কাকতি প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ চর্যার কোনো কোনো ' শব্দ 'র সঙ্গে ' প্রাচীন অসমীয়া '-র ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন । আর প্রাচীন অসমীয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলে 'কামরূপী 'র সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা খুবই সম্ভব । সম্ভবত: এই কারণেই ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন —[২২]

বৌদ্ধ চর্যা গান ও দোহার প্রাপ্তি স্থান নেপাল । যদি অনুমান করি , এগুলোর রচনাস্থল প্রাপ্তিস্থানের কাছাকাছি , তাহলে কি অন্যায় হবে ? নেপালের যত কাছে উত্তরবঙ্গ কামরূপ প্রত্যন্তদেশ , তত কাছে নয় রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) ও সমতট (পূর্ববঙ্গ) ।"

' চর্যাগীতিকার ' পর বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম পুঁথি ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ' । ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে —[২৩] " ইহাতে পশ্চিম বঙ্গীয় আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যযুগীয় আদিপর্বের মূল লক্ষণগুলি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে ।" অন্যত্র ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন —[২৪]

" শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে মধ্যকালীন বাংলা ভাষার অবিকৃত প্রাচীন রূপটি যে পরিমাণে আছে ততটা আর কোনো পুরানো রচনায় নাই । চর্যাপদাবলীর পরেই বাংলা ভাষার পুরানো নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে বহুল লভ্য । একথা মোটামুটি ঠিক । তবে সত্য করিয়া বলিতে হয় যে আমরা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পুঁথিতে আবদ্ধ ও জমাট বাঁধা চতুর্দশ - পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দের [illegible] সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণ পাই নাই । পাইয়াছি মোটামুটি মধ্যকালীন বাংলা ভাষা — যাহা দক্ষিণ - পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোটামুটি অবিকৃত রূপে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে ।"

কিন্তু কামরূপী উপভাষার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, আদিমধ্য বাংলা ভাষার ধ্বনিগত এবং রূপগত বৈশিষ্ট্য অনেকটাই এতে বজায় আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষার সঙ্গে 'কামরূপী'রও কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

কামতায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের সূচনায় বা তারও আগে মহারাজ দুর্লভ নারায়ণ ও ইন্দ্র নারায়ণের পৃষ্ঠপোষণায়। রায় কে. এল. বরুয়া বাহাদুরের মতে[২৫] পিতাপুত্র দুর্লভ নারায়ণ ও ইন্দ্র নারায়ণের মিলিত রাজত্বকাল সীমা ১৩৩০ – ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। এ সময় হেম সরস্বতী, কবিরত্ন সরস্বতী, হরিবর বিপ্র প্রমুখ কবিরা সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বনে বিবিধ আখ্যান কাব্য রচনা করেন। ডঃ জয় কুমার চক্রবর্তীর মতে এঁরা সকলেই মালাধর বসু এবং বড়ু চণ্ডীদাস অপেক্ষা প্রাচীনতর।[২৬]

"All these poets flourished before Maladhar Basu, the poet of Sri Krsna Vijay and Baru Chandidasa, the poet of Sri Krsna Kirttana".

ডঃ চক্রবর্তীর এই দাবী বিতর্ক রহিত নয়। ইতিহাসের সন্ তারিখ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ - পত্রাদির উল্লেখ তাঁর গবেষণা গ্রন্থে নেই। পুঁথির ভাষা বিচার দ্বারা কাল - নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ কর্ম এবং তাতে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র পুঁথির [illegible]x এবং ভাষার প্রাচীনত্ব যদি সংশয় রহিত না হয়, তবে উল্লিখিত কবিদের রচিত পুঁথির কাল নির্ণয় (শুধু ভাষা বিচারে) প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। কাজেই ইতিহাসের সন্তারিখের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়।

'অসমীয়া' ভাষার সঙ্গে 'বাংলা' ভাষার সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন –[২৭]

"The agreement between Assamese and Bengali is so close that the dialects of Bengali and Assamese may be described as belonging to the same group. Dialects are independent of literary speech : as such East Bengali dialects, North Bengali dialects (with which Assamese is to be associated) and West Bengali dialects are not only independent of one another, but also they are not as it is popularly believed in Bengal, derived from literary Bengali, the « Sadhu - bhasa » , which is a composite speech on early West Bengali basis. Assamese dissociated itself from the other Bengali dialects when the speakers of these acknowledged the supremacy of a literary Bengali, and thus accepted the bonds of linguistic union, Assamese continued to be the language of an independent community ; and, under the peculiar circumstances under which it was placed, as it progressed deeper and deeper into the Brahmaputra valley among the Bodo and other Tibeto-Burman, and Shan peoples, it developed some peculiarities of its own. The earliest Assamese remains date from the middle of the 15th century; and at that time the language is practically identical with contemporarary literary Bengali as employed in North and East Bengal, with the distinctive Assamese characteristics rare and not at all prominent."

উদ্ধৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ——

প্রথমত, উত্তর বঙ্গের উপভাষার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার সম্পর্ক নিবিড়। দ্বিতীয়ত উত্তর-বঙ্গ থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গভীরে যতই সরেছে, ততই পার্থক্য ~~[illegible]~~ কিছুটা করে বেড়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, উপভাষাগুলি সাধু ভাষা বা সাহিত্যের ভাষার উপর নির্ভরশীল নয়।

তৃতীয়ত, প্রাচীন অসমীয়া ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। আর সে সময় উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে এর পার্থক্য ছিল না বললেই চলে। এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে —

"Contemporary literary Bengali as employed in North Bengal and Est Bengal."

দেখা যাচ্ছে পঞ্চদশ [redacted] শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে (এবং কামরূপে) একটি সাহিত্য চর্চার ভাষা ছিল যার সঙ্গে তৎকালীন অসমীয়া ভাষার বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। উত্তর কালে এই ভাষাতেই কোচ শাসনাধীন কামতার কবিরা সাহিত্য রচনা করেছেন। দীর্ঘ চারশ' বছর ধরে যে ভাষায় সাহিত্য চর্চা হয়েছে তাকে 'উপভাষা' আখ্যা দেয়া অনুচিত বলেই মনে করি। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বক্তব্যটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ —[২৮]

" when we talk of speakers of dialect, we imply that they employ a provincial method of speech to which the man who has been educated to use the language of books, is unaccustommed. Such a man finds that the dialect speakers frequently uses words or modes of expression which he does not understand or which are at any rate strange to him." (Skeat: English Dialects pp - 1 - 2)

এই বক্তব্যের আলোকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির ভাষা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

(ক) হেম সরস্বতীর " প্রহ্লাদ চরিত্রের " ভণিতা :[২৯]

কামতা মণ্ডল　　দুর্লভ নারায়ণ　　নৃপবর অনুপাম।
তাহান রাজ্যত　　রুদ্র সরস্বতী　　দেবযানী কন্যানাম॥
তাহান তনয়　　হেম সরস্বতী　　ধ্রুবর অনুজ ভাই।
পদবন্ধে তেহোঁ　　প্রচার করিলা　　বামন পুরাণ চাই॥

(খ) দ্রোণ পর্বাবলম্বনে 'জয়দ্রথ বধ' কাব্যে কবিরত্ন সরস্বতীর ভণিতা : [৩০]

নৃপ শিরোমণি　　দেব মহামানী　　দুর্লভ নারায়ণ রাজা ।
নিতে পুত্রবতে　　পালিলা সততে　　পৃথিবীর যত প্রজা ।।
তাহান তনয়　　ভৈল ধর্মময়　　ইন্দ্র নারায়ণ দেব ।
মহাবীর ধীর　　সুভাবে গম্ভীর　　নিতে কৃত হরি সেব ।।

*　　*　　*

ছোট শিলা নাম　　আছে একগ্রাম　　সতগ্রাম মধ্যে সার ।
আছিল উৎপতি　　জগত প্রখ্যাতি　　চতুর্পাণি শিকদার ।।

*　　*　　*

তাহান তনয়　　অতি শুভ নয়　　কবিরত্ন সরস্বতী ।
দ্রোণ পর্ব্বপদ　　জয়দ্রথ বধ　　কৌতুহলে নিরবধি ।।

(গ) দুর্লভ নারায়ণের রাজত্বকালের কবি হরিবর বিপ্র লিখেছেন — [৩১]

তাহান রাজ্যত স্থিত　　সর্ব্বজন মনোনীত
জয়মেধ পর্ব্ব মধ্যে সার ।
বিপ্র হরিবর কবি　　হরির চরণ সেবি
পদবন্ধে করিলো প্রচার ।।

উদ্ধৃতি গুলির ভাষায় উদ্ভব - কালের রূপটি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এমন দাবী করা যাবে না । বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লিপিকরের হাতে আদিরূপটি পরিবর্তিত হয়েছে । কিন্তু এ ভাষা 'ডায়ালেক্ট' নয় । আধুনিক কালের শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের কাছেও এটি দুর্বোধ্য বলে মনে হবে না । আদিমধ্য যুগের এই ভাষাই পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নেমে এসেছে । কামতার সাহিত্য রচিত হয়েছে এই ভাষাতেই ।

মধ্যযুগের বাংলা - সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের আরও একটি সুচিন্তিত মন্তব্য স্মরণীয় —[৩২]

"The help afforded by Middle Bengali literature, which covers a period from the 14th to the 18th century, is not as great as it might be expected, in tracing the history of Bengali. Early works as a rule have not been preserved in their original shapes, almost always in language and frequently in subject matter. The oldest MSS., mainly on paper, and also frequently on palm-leaf, seldom go beyond the middle of the 16th century, and commonly these are of the 17th and 18th centuries ; and these give but late recensions of earlier works, in which it is useless to expect anything like a faithful representation of the ~~as~~ author's language . By the beginning of the 15th century (but the tendency or movement had started considerably earlier) a standard literary Bengali grew up and repidly came to be used all over Bengal. This was the more or less conventional language of verse .... MSS. do frequently show local forms : but in an ordinary Middle Bengali MS., no matter where it was written, we always find standard literary forms which are even now unknown to the spoken language of the place, side by side with the genuine dialectal ones."

এই "standard literary Bengali" কোথায় গড়ে উঠেছিল ? কোথায় কোথায় এর গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়ে ছিল পঞ্চদশ শতকের অনেক আগে থেকে ? ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ও প্রায় অনুরূপ প্রশ্ন তুলেছেন —[৩৩]

" পাল রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল ? করতোয়ার পশ্চিম পারে ? তাঁদের রাজ্যের বিস্তার কি করতোয়ার উভয় পারেই ছিল না ? করতোয়ার পশ্চিম পারে কি ভাষা ছিল ? মাগধী প্রাকৃত বা অবহট্ঠ ? তা-ই যদি হয় , তবে করতোয়ার পূর্ব পারে কি সেই ভাষাই ছিল না ? উত্তর বঙ্গে শেয়াল পাড়া , গুয়াহাটী , দরং , বিজনীতে একই ভাষার ব্যবহার ছিল না কি ? করতোয়া ঘেঁষা কামরূপী ভাষা করতোয়ার পশ্চিম পারের ভাষা থেকে অভিন্ন থাকা স্বাভাবিক । "

ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে গুপ্ত যুগেই পূর্বোত্তর ভারতে পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণ সমাজ গড়ে উঠেছিল । কামতার ধর্মপালের তাম্র শাসনের দ্বিতীয় শ্লোকের অংশ বিশেষের অনুবাদ নীচে দেয়া হলো —[১৪]

" ব্রাহ্মণ সমূহ কর্তৃক অধ্যুষিত ঐশ্বর্যাচরণ দ্বারা অকলুষিত প্রজাপতি কর্তৃক অতিযত্নে নির্মিত ধর্ম মন্দিরের ন্যায় খ্যাতিপুন্ডি নামে একটি গ্রাম আছে । যে স্থানে যাজ্ঞিক গণের যজ্ঞ হোমাগ্নি জাত ধূমরাজি আকাশে উত্থিত হইলে কৃষ্ণমেঘ ভ্রমে উর্ধশিখ ময়ূরেরা অকালে নৃত্যাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হইত —— " ইত্যাদি ।

এই ধর্মপাল আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । তখন কামরূপে আর্যভাষা ও সাহিত্যের চর্চা পূর্ণোদ্যমে চলেছে । কাজেই মাগধি অপভ্রংশ রূপে অন্তত আর্য ভাষা সাহিত্যের ভাষারূপে এ অঞ্চলে গড়ে উঠতে পারে । গৌড়ের সঙ্গে কামতার ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয় । পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ অনুমান কি করা যায় না যে , মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চার ভাষার অন্যতম উদ্ভব-ভূমি এই পশ্চিম কামরূপ বা কামতা ? আর পঞ্চদশ শতকে [ডঃ সুকুমার সেনের মতে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত] বাংলা ও অসমীয়া ভাষা যদি প্রায় অভিন্ন থেকে থাকে তবে কামতার ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য থাকাটাই আশ্চর্যের ব্যাপার হবে । সেহলে , হেম সরস্বতী , কবিরত্ন সরস্বতী প্রভৃতির রচনাবলী অথবা ষোড়শ শতকে কোচ শাসনাধীন কামরূপের কবিদের (শ্রী শঙ্কর দেব , মাধব দেব , অনন্ত কন্দলী , কংসারি প্রমুখ) রচনাবলী কোন্ সাহিত্য ভান্ডারের সামগ্রী হবে ? বাংলা , না

অসমীয়া ? এঁরা সকলেই কোচ রাজন্য বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য সাধনা করেছিলেন । প্রসঙ্গত: ডঃ সেনগুপ্তের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে —[৩৫]

" শঙ্কর দেবের উপরেও অসমীয়া সাহিত্য দাবি করে থাকে । তাঁর উপরে বাঙালিদের দাবি তার চেয়েও বেশি । "

পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকে কামতায় রচিত সাহিত্য - সম্ভারকে বাঙালীরা ফেলে সরিয়ে দিয়েছেন চরম অবহেলার সঙ্গে , আর অসমীয়ারা তাকে পরম সমাদরে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন নিজেদের সাহিত্য ভান্ডারে । আমাদের বিচারে এ সাহিত্য সম্পদ বাংলা এবং আসাম উভয়েরই । বহতা নদী কোন একটি বিশেষ তটের নয় । উভয় তটরেখা স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়ে থাকে বলে তার উপরে দুই - তটেরই সমান দাবী থাকে । তেমনি কামতার এই সাহিত্য প্রবাহও বাংলা এবং আসাম উভয়কে স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়েছে । এই কারণেই রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য আলোচনায় উল্লিখিত কবিদের রচনাবলীও আলোচিত হয়েছে ।

রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার কালসীমা ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশক পর্যন্ত । অবশ্য কামতায় সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল তার অনেক আগেই । প্রায় ' চারশ ' বছরের সারস্বত সাধনা যে সাহিত্য সম্ভার উপহার দিয়েছে তার পরিমাণ শত প্রাচুর্য বিপুল হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে , সৃষ্টির তুলনায় সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত পুঁথিপত্র বা মুদ্রিত পুস্তকাদির সংখ্যা খুবই কম । রাজন্য বর্গের সাহিত্য সাধনার আগ্রহ যতটা ছিল , গ্রন্থাদির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ , তালিকা প্রণয়ন বা উত্তর কালে মুদ্রণ ও প্রচারের উৎসাহ ততটা ছিল না । ফলে গ্রন্থভূক কীট এবং সর্বভূক অগ্নিও এই সব রচনার বেশ কিছুটা উদরসাৎ করেছে । অনেক রচনা হারিয়ে গেছে ।
বেশ কিছু পুঁথি হয়ত কারো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে । কিছু আছে বিভিন্ন

গ্রন্থাগারে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় । রাজন্যবর্গ তো বটেই , পরবর্তী কালে জাতীয় সরকারও সময়োচিত এবং যথোচিত উদ্যম দেখান নি । শুধু মাত্র কোচ - রাজ্যের অন্তিম লগ্নে (১৯৪৮ খ্রীঃ) প্রয়াত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় — A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts (Preserved in the State Library of Cooch Behar) — নামে একটি পুঁথি - তালিকা প্রকাশিত হয় । এতে ১০২ টি বাংলা পুঁথি এবং ১৯ টি (ঊনিশটি) অসমীয়া পুঁথির উল্লেখ রয়েছে । এই পুঁথিগুলি বর্তমানে North Bengal State Library তে (Cooch Behar) [redacted] রক্ষিত ।

সরকারী উদ্যোগের পরিসমাপ্তি এখানেই । এর দীর্ঘকাল পরে (১৯৭০ খ্রীঃ) ডঃ সুবোধ রঞ্জন রায় " কোচবিহার সাহিত্য সভায় " সংগৃহীত বাংলা পুঁথি পরিচয় " শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেন । এতে একত্রিশটি পুঁথির উল্লেখ রয়েছে ।
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথিগুলোকে দুটি শ্রেণীতে [redacted] বিন্যস্ত করেছেন —

(ক) বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ।
(খ) কোচ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কামতায় রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ।

ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর তালিকা গ্রন্থের পরিশিষ্টে অসমীয়া পুঁথির উল্লেখ মাত্র করেছেন ।

ডঃ সুবোধ রঞ্জন রায় কৃত তালিকাটিতে তেমন কোন শ্রেণী বিন্যাস নেই । পুঁথি দৃষ্টে তিনি তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র ।

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ দিলীপ কুমার কাঞ্জিলালের প্রয়াসে কোচবিহার সাহিত্য সভা থেকে

" A descriptive catalogue of the Sanskrit Manuscripts Preserved in the Sahitya Sabha of Cooch Behar " প্রকাশিত হয় । ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অনুসরণে ডঃ কাঞ্জিলালও সংস্কৃত পুঁথিগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেন এবং শ্রেণীদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন । যদিও বর্তমান প্রকল্পের সঙ্গে ডঃ কাঞ্জিলাল-কৃত তালিকা গ্রন্থটির প্রত্যক্ষ যোগ নেই ,

তবুও উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। ডঃ কান্তিলালের সুচিন্তিত বক্তব্য কোচবিহারের রাজ-পরিবারের সাংস্কৃতিক চেতনার বিশিষ্টতা উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

বাংলা পুঁথির তালিকা দুটির মধ্যে প্রথমে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত - কৃত তালিকাটির গুরুত্ব তুলনা রহিত। কোচবিহারের সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁরই অসামান্য প্রচেষ্টায়। তবে একটা কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই তালিকাটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। একাধিক পুঁথির নামে ও বিষয় বস্তুতে অসঙ্গতি রয়েছে। যেমন, ১০ সংখ্যক পুঁথিটিকে 'কিরাত পর্ব' বলা হলেও আসলে এটি বনপর্বের অন্তর্গত 'ঘোষযাত্রা' অধ্যায়। অনন্ত কন্দলীর (পুঁথি নং ১০২, মহাভারত - রাজসূয়) একটি পুঁথিকে বাংলা পুঁথির তালিকায় এবং অপর একটি [illegible] পুঁথিকে (অসমীয়া পুঁথি নং ১১, ভাগবত ১০ম স্কন্ধ) অসমীয়া পুঁথির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই অসঙ্গতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন —

"The language of the texts, composed by the poets of Cooch Behar and around (some poets hailed from Kamarupa) also shows striking similarity. It represents the dialectal peculiarities of the form of Bengali that was prevalent in North eastern parts of Bengal from the sixteenth to the nineteenth centuries, and as such it shows striking affinity with the Assamese language in vocabulary as well as in phonology and morphology. As a matter of fact it is pretty difficult to make any clearcut distinction between the language employed by these poets and that employed by Ananta Kandali, who is generally claimed to be an Assamese poet." (Intorduction. p. vii & viii Descriptive catalogue of Bengali Manuscripts - Cooch Behar)

ভাষা বিষয়ে আলোচনার সময় ও সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে কোচ রাজ সভার বাইরেও (অথচ কোচ রাজত্বে) অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে । শঙ্কর দেবের তৃতীয় পর্বের রচনাবলী মহারাজ নর - নারায়ণের রাজত্বে রচিত হলেও তিনি সভা কবি ছিলেন না । ' রাম বিজয় ' নাট এবং ' রাজভটিমা ' ছাড়া শঙ্করের আর কোনো রচনায় কোচ রাজ প্রশস্তি নেই ।

ড: দাশগুপ্ত এবং ড: রায় কৃত তালিকা দুটি , একক বা যুগ্ম , কোনো ভাবেই রাজ শাসনাধীন কোচবিহারের সাহিত্য সম্ভারের সবটুকু প্রকাশ করেনি । যে সব গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে অথবা যে সব রচনার পাণ্ডুলিপি অন্যত্র রয়েছে , সেগুলো এই তালিকাভুক্ত হয়নি । তাছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনাবলীরও কোনো উল্লেখ এই দুটি তালিকার একটিতেও নেই । কারন সেগুলো পুস্তকাকারেই প্রকাশিত হয়েছে ।

সম্প্রতি - অপ্রচলতা প্রভৃতি স্বীকার করে নিয়ে রাজন্য শাসিত কোচবিহারে বিভিন্ন রাজার রাজত্ব কালে রচিত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি ।

প্রদত্ত বিবরণে 'পুঁথি নং ' বলে যা কিছু উল্লেখ করা হবে তা সবই ড: শশি - ভূষণ দাশগুপ্ত কৃত " A Descriptive catalogue of Bengali Manuscripts Preserved in the State Library of Cooch Behar"- তালিকার ' পাণ্ডুলিপি - নং ' বোঝাবে ।

<u>মহারাজ বিশ্বসিংহ (১৫১৫ খ্রী: —— ১৫৩০ খ্রী:)</u>

মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে কোচরাজ্যে যে সব কবি সাহিত্য - সাধনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পীতাম্বর প্রবীন । পীতাম্বরের রচিত ~~গ্রন্থসমূ~~ গ্রন্থসমূহ হচ্ছে ——

(১) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (পুথি নং ৮ এবং ১৩) । দুটি পুঁথিই বর্তমানে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে আছে । দ্বিতীয় পুঁথিটি মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে অনুলিখিত ।

(২) ভাগবত - ১০ম স্কন্ধ (পুঁথি নং ৫৬) উঃ বঃ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ।
(৩) ভাগবত - ১ম স্কন্ধ ।

এর কোনো পুঁথি পাওয়া যায়নি । খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদের 'কোচবিহারের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), ১৩১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এর উল্লেখ আছে ।

(৪) উমাপরিণয় (মুদ্রিত) — ডঃ মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত এবং লোলাঘাট বরুয়া ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত ।

(৫) 'নল - দময়ন্তী' উপাখ্যান — এটির রচনা কাল ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ । অর্থাৎ মহারাজ নর নারায়ণের রাজত্বকালে । ডঃ নেওগ ও ডঃ শর্মা এর উল্লেখ করেছেন । পীতাম্বর কেবল প্রবীণ কবি নন, সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম সভা - কবি রূপে কোচ রাজ সভায় পুরাণাদির অনুবাদ শুরু করেন । মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভণিতায় আছে —[36]

মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে । তার পুত্র জ্যেষ্ঠ তুল্য নাহি পুরন্দরে ।।
একদিন সভামধ্যে বসি যুব রাজ । মনে আলোচিয়া দেখ কহিলন্ত কাজ ।।
পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রুতি রহস্য অক্ষয় । পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয় ।।
একারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার । নিজদেশ ভাষা বন্দ রচিয়ো পয়ার ।।
মহামায়া চরণ কমল মনে স্মরি । রাজ কুমারের আজ্ঞা মনে শিরে ধরি ।।
বেদশর বান আর শশাঙ্ক শকত । আরম্ভ করিল মার্কণ্ডেয় কথা জত ।।

অন্যত্র এই যুবরাজের নাম উল্লিখিত হয়েছে —[37]

" কুমার সমর সিংহ আজ্ঞা পরমাণে । পুন্য কথা সুপত্রা(গ্রা)র পিতাম্বরে ভনে ।।

দেখা যাচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুবাদ শুরু হয়েছিল ১৫২৪ শকে অর্থাৎ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে । তখন মহারাজ লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্বকাল । ডঃ সুকুমার সেন এই অঙ্কটি লক্ষ্য করে বললেন যে প্রকৃত পাঠ হবে —[38]

" শর বান বেদ আর শশাঙ্ক শকত " । এই পাঠ ধরলে কাব্যারম্ভের কাল হয় ১৪৫২ শক বা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ । মহারাজ বিশ্বসিংহ তখন কামতার সিংহাসনে

আসীন। কিন্তু আরও একটি সমস্যা দেখা দিল যুবরাজ বা কুমার সমর সিংহকে নিয়ে। মহারাজ বিশ্বসিংহের পুত্রদের মধ্যে সমর সিংহ নামে কেউ ছিলেন বলে শোনা যায় না। ভাগবত - ১০ম স্কন্ধের ভণিতায় আবার (কুমার) সমর শেখর - সিংহ নামটি পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন লিখলেন — "শুক্লধ্বজের আসল নাম (অথবা নামান্তর) ছিল সংগ্রাম সিংহ। দরঙ্গ রাজ বংশাবলীতে উল্লিখিত 'নরসিংহই পীতাম্বর - উল্লিখিত সমর সিংহ বা সমর শেখর সিংহ বা শেখর সিংহ বলিয়া মনে হয়।"[৩৯] কিন্তু ডঃ সেনের এই অভিমত বা অনুমান যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ —

(ক) 'কোচবিহারের ইতিহাস' থেকে জানা যায় যে বিশ্বসিংহের পরলোক গমনের পর কুমার নরসিংহ বৎসর কালের জন্য রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু মল্লদেব স্বীয় অনুজ শুক্লধ্বজের সহায়তায় তাকে বিতাড়িত করে সিংহাসন অধিকার করেন। অতএব শুক্লধ্বজ আর নরসিংহ অভিন্ন নন।

(খ) কোচবিহারের কোনো ইতিহাসেই শুক্লধ্বজকে শেখর সিংহ, সমর সিংহ বলে অভিহিত করা হয়নি। শিলালিপি বা বিদেশী পর্যটকের বিবরণেও নয়। তাহলে ডঃ সেনের এ অনুমান কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে?

কোচরাজ সভায় যাঁর আগ্রহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় সভা সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল, সেই সমর সিংহের পরিচয় অস্পষ্টতাই থেকে গেল। সম্প্রতি শ্রী বসন্ত চৌধুরী এবং শ্রী পরিমল রায় কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি স্বর্ণমুদ্রা (যেটি ১৯৭৪ খ্রীঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত All India Numismatic Conference - প্রদর্শিত হয়েছিল) এ ব্যাপারে নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।[৪০] নর নারায়ণের রৌপ্যমুদ্রায় পাঠ ~~—~~ সম্মুখে — "শ্রীশ্রী মল্লর নারায়ণ ভূপাল সস্ত শাকে ১৪৭৭" পৃষ্ঠে — "শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধু করস্য।"

আর উল্লিখিত স্বর্ণমুদ্রায় —

সম্মুখের পাঠ — দিগ্বিজয়ী সমর সিংহ - শ্রীমল্লনরনারায়ণ - ভূপালস্য।

শক - ১৪৮৬।

পৃষ্ঠির পাঠ – শ্রীশ্রী হরগৌরী চরনেক – ম ন – মধুক রস্য ।

তাহলে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, মহারাজ নর নারায়ণ এবং যুবরাজ সমর সিংহ এক ও অভিন্ন । তবুও সংশয় থাকে । ১৪৭৭ শকের মুদ্রায় 'সমরসিংহ' নামটির উল্লেখ নেই, অথচ ১৪৮৬ শকের স্বর্ণমুদ্রায় তা লেখা হলো । দ্বিতীয়ত, ঐ স্বর্ণমুদ্রায় রাধা কৃষ্ণ যুগল মূর্তি আছে । কোচবিহারের অধিদেবতা মদন মোহনের সঙ্গেও রাধা মূর্তি নেই । এটাই কোচবিহারের বিশিষ্টতা । রাধা-কৃষ্ণ যুগল মূর্তি মুদ্রায় উৎকীর্ণ হওয়াটা বিস্ময়ের ব্যাপার । তৃতীয়ত, মহারাজ নর নারায়ণ মল্লদেব বা মল্ল নৃপতি নামেও অভিহিত হতেন, কিন্তু 'সমর সিংহ' নামে উত্তর কালে কখনো অভিহিত হয়েছেন বলে জানা যায় নি । কাজেই অস্পষ্টতা যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেছে । কেবল নতুন চিন্তার সুযোগ মিলেছে ।

বিশ্বসিংহের রাজত্ব কালের ব্যক্ত যে দুজন কবির সন্ধান পাওয়া যায় তাঁরা হলেন মনকর এবং দুর্গাবর ।

মনকর 'মনসা' মঙ্গলের অংশবিশেষ রচনা করেছিলেন অথবা তাঁর রচনার অংশবিশেষই শুধু পাওয়া গিয়েছে । কাব্যটির নাম — " গোঞার পাঁচালী বা পুরাণের গীত ।" এটি বর্তমানে মুদ্রিত এবং ডঃ বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া এবং ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা সম্পাদিত "মনসা কাব্য" – ১ম খণ্ডের প্রথম ভাগ নামে প্রকাশিত হয়েছে । অপর কবি হচ্ছেন দুর্গাবর । তাঁর রচনা —

(ক) গোঞা বেহুলী মঙ্গল – ডঃ বড়ুয়া এবং ডঃ শর্মা সম্পাদিত উল্লিখিত 'মনসা' কাব্যের শেষাংশ । প্রকৃত পক্ষে মনকর এবং দুর্গাবরের 'মনসা' কাব্য একটি অপরটির পরিপূরক । মনকর সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে মনসার জন্ম পর্যন্ত এবং দুর্গাবর চাঁদ-মনসার বিরোধের সূচনা থেকে লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ।

(খ) দুর্গাবরী গীতি রামায়ণ — (অরণ্য থেকে উত্তর কাণ্ড) ডঃ মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত ।

মনকর এবং দুর্গাবর উভয়েই কামতার রাজা - রাজ মহিষী ও রাজপুত্রদের সংক্ষিপ্ত

প্রাপ্তি রচনার মধ্যদিয়ে কাব্যারম্ভ করেছেন। দুর্গাবর সরাসরি মহারাজ বিশ্বসিংহের উল্লেখ করেছেন। আর মনকরের কাব্যে জল্পেশ্বরের বন্দনা আছে। ডঃ বরুয়া এবং ডঃ শর্মার মতে এই 'জল্পেশ্বর' সম্ভবতঃ মহারাজ বিশ্বসিংহ[৪১]।

<u>মহারাজ নর নারায়ণ</u>(১৫৩৪ — ১৫৮৭ খ্রীঃ):

মহারাজ নর নারায়ণের রাজত্ব কালে যে সব কবি কোচবিহারে বা কোচরাজ্যে থেকে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীশ্রী শঙ্কর দেব প্রবীন। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন — অনন্ত কন্দলী, অনিরুদ্ধ বা রাম সরস্বতী, কংসারি কায়স্থ, কলাপ চন্দ্র প্রভৃতি।

শ্রীশ্রী শঙ্কর দেব :— ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে শঙ্কর দেবের সাহিত্য সাধনার শেষ কাল বা পর্বটি ('কোচ-রাজ্যত কাটোয়া কাল' — ১৫৪০ খ্রীঃ — ১৫৬৮ খ্রীঃ) পূর্ণতম মনোবিকাশের কাল। এই পর্বের রচনাবলীর একটি তালিকাও তিনি দিয়েছেন।[৪২]

(১) ভাগবত — প্রথম, দ্বিতীয়, নবম, দশম এবং একাদশ স্কন্ধ।
(১ম এবং ১১শ স্কন্ধের পুঁথি কোচবিহার উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে আছে)

(২) ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ অবলম্বনে রচিত আখ্যান কাব্য —
(ক) বলিছলন (ভাঃ ৮ম স্কন্ধ), অনাদি পাতন (ভাঃ ৩য় স্কন্ধ বামন পুরাণ এবং অন্যান্য কথা অবলম্বনে রচিত)
(খ) ভাগবত — ১০ম স্কন্ধের উত্তরার্ধ এবং ১১শ ও ১২শ স্কন্ধের কাহিনী কীর্তন।
(গ) কুরুক্ষেত্র, নিমি-নবসিদ্ধ সংবাদ, গুণমালা।
(ঘ) রামায়ণ — উত্তর কাণ্ড।
(ঙ) বরগীত, তোটয়, ভটিমা।
(চ) ভক্তি-রত্নাকর (সংস্কৃত ভাষায় রচিত)।
(ছ) নাট — কালিদমন, কেলিগোপাল, রুক্মিণী হরণ, পারিজাত হরণ, রাম-বিজয়।

শঙ্কর সাহিত্য এখন মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। কোনো রচনাতেই কোনো কালজ্ঞাপক শ্লোক বা পৃষ্ঠপোষকের প্রশস্তি নেই। কেবল নাটগুলোতে কিছু কিছু প্রশস্তি আছে। তাঁর শেষ রচনায় অর্থাৎ 'রাম বিজয়' নাটটিতে শুক্লধ্বজের প্রশস্তি আছে। আর দুটি 'রাজ ভটিমায়' শ্রীশ্রী শঙ্করদেব মহারাজ নর-নারায়ণের অকুণ্ঠ প্রশস্তি গেয়েছেন।[৪৩]

<u>অনিরুদ্ধ বা রাম সরস্বতী :</u>

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন —[৪৪] 'শুক্লধ্বজের সভায় পুরাণ পাঠক ও কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অনিরুদ্ধ। ইঁহার উপাধি রাম সরস্বতী। তবে রাম-সরস্বতীর রচনায় মহারাজ নর নারায়ণ, শুক্লধ্বজ ও রঘুদেব নারায়ণের ভণিতাও আছে। সম্ভবত এ জন্যই ডঃ মহেশ্বর নেওগ প্রশ্নাত্মক মন্তব্য করেছেন বহু রাজার অনুভোজী রাম সরস্বতী সম্বন্ধে।[৪৫] ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা রাম সরস্বতীর রচনাবলীর একটি তালিকা দিয়েছেন —[৪৬]

(১) মহাভারত — আদি, সভা (শুক্ল ও গোপীনাথের সহায়তায়), বন, বিরাট (কীচকবধ পর্যন্ত), ভীষ্ম (বেহুলার অংশ), উদ্যোগ, দ্রোণ, কর্ণ, গদা ও শান্তি পর্ব।

(২) জয়দেব কাব্য — "কাব্যটিতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় গীত-গোবিন্দ পদাবলীকে বর্ণনায় রূপ দেওয়া হইয়াছে।"[৪৭]

কবি নিজেই বলেছেন —

'জয়দেব নামে কাব্য বিরচিলো সার।
শুক্লধ্বজ রাজ টীকা করিলন্ত যার।।

গীত গোবিন্দ, কালীরাম দেবশর্মা সংগৃহীত (১২৯০) পৃঃ ২।

(৩) আখ্যান কাব্য — বিজয় পর্ব, মনি চন্দ্র ঘোষ পর্ব, কুলাচল বধ, জঙ্ঘাসুর বধ, জটাসুর বধ, পদ্মাবতী বিবাহ, পুষ্পহরণ পর্ব, কালকূট সোমক বধ, বকাসুর বধ, সিন্ধুরা বধ, ঘটাসুর বধ, ব্যাসাশ্রম, অশ্বকর্ণের যুদ্ধ, বাঞ্জন পর্ব, ভীষ্ম চরিত, বিহঙ্গম (যোগকাব্য)।

ডঃ নেওগ এবং ডঃ শর্মার মতে উদ্ধৃত আখ্যান কাব্যগুলোর অধিকাংশই মহারাজ নর নারায়ণের সময়েই রচিত হয়েছিল।

<u>অনন্ত কন্দলী</u> ঃ

ষোড়শ শতকের কামতার অন্যতম শক্তিশালী কবি অনন্ত কন্দলী মহারাজ নর-নারায়ণের সভাসদ ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে।[৪৮] কন্দলীর রচনা —

১। ভাগবত — দশম স্কন্ধ — অসমীয়া পুঁথি নং - ১১

২। মহাভারত — রাজসূয় — পুঁথি নং ১০২

(উভয় পুঁথিই অসম্পূর্ণ এবং বর্তমানে কোচবিহার উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত।)

অনন্ত কন্দলীর অন্যান্য যে সব রচনার উল্লেখ অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে আছে,[৪৯] সেগুলোর নাম নীচে দেয়া হলো —

রামায়ণ, কুমার-হরণ কাব্য, সীতার পাতাল প্রবেশ নাট, ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত বৃত্রাসুর বধ এবং মহীরাবণ বধ। শেষোক্ত কাব্যটির পরিকল্পনায় তিনি সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা মনে করেন।

কংসারি — রাম সরস্বতী তাঁর "পুষ্পহরণ" (বনপর্ব অবলম্বনে রচিত) আখ্যানের ভণিতায় লিখেছেন যে, মহারাজ নর নারায়ণের আদেশ ক্রমে মহাভারত রচনায় (অর্থাৎ অনুবাদে) ব্রতী হলে কংসারি প্রমুখ কবিরা সেই রচনা কার্যে সহায়তা করেন —

কংসারি প্রমুখ্যে ঋষি (কবি) আছা যত যত,
সি সবেও পদচয় করিলা পাচত।[৫০]

কংসারির রচনাবলী —

১। কিরাত পর্ব

২। বিরাট পর্ব (আংশিক)

ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর তালিকা গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে - A list of Assamese Manuscripts -এর ৯৬নং পুঁথিটিকে কংসারি রচিত মহাভারত বলে চিহ্নিত করেছেন । কিন্তু বর্ত্তমানে সে মোড়কে যে পুঁথিটি আছে তা কংসারির নয় । পক্ষান্তরে , ড: দাশগুপ্তের তালিকা গ্রন্থের অতিরিক্ত একটি পুঁথিতে (পুঁথি নং ১০-ক) কংসারি রচিত কিরাত - পর্বের অংশ বিশেষ পাওয়া যায় । এতে পৃষ্ঠপোষকের নাম বা রচনা কাল — কিছুই উল্লেখ নেই । তবে ভণিতায় কবির নাম পাওয়া যায় —

সুনিয়োক সভাসদ অরণ্য পর্ব্বের পদ
মধুর ভারথি অনুপাম ।
মধ্যে মধ্যে হরিযশ মিশ্র তাত সুধা রস
শ্রবণ রমণ পুণ ধাম ।।
নমো নমো নারায়ণ ভব বন্ধ বিনাশন
কলির পাথাতে দিয়া ভরি ।
এ সব দোষত্রুটি ক্ষবি রচিল কংসারি কবি
নিরন্তরে বোলা হরি হরি ।। (পৃ : ৬১৪)

কংসারি তাঁর কাব্যকে ' অরণ্য পর্ব ' বলেছেন । অথচ পুঁথির পাটার উপরে কিরাত পর্ব লেখা আছে । ড: সুকুমার সেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড - পূর্বার্ধ - ৬ ষ্ঠ সংস্করণ পৃ : ২৭৫) ' বনপর্ব ' রচয়িতা জনৈক কৌশারি নামে কবির কথা বলেছেন । কিন্তু কোচ রাজসভায় বা কোচরাজ্যে ' কৌশারি ' নামে কোনো কবি ছিলেন - এমন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই ।

মহারাজ নর নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কলাপ চন্দ্র নামে এক কবি ভাগবত - ৪ র্থ স্কন্ধের অংশবিশেষ অনুবাদ করেন । একটি ভণিতায় মহারাজের প্রশস্তি আছে —

সিটো রাজ রাজেশ্বর । দুর্জ্জনর দণ্ড ধর ।।
নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞানী । নৃপতির চূড়া মণি ।।
বিপক্ষক জিনন্তাক । সুখে রাজ্য করন্তাক ।।
তান প্রসাদত মই । রচিলো পয়ার চয় ।।
জানে তার অভিপ্রায় । মহন্তসে সমুদায় ।।
বদতি কলাপ চন্দ্র । বোলা রাম রাম ফন্ড ।।[৫১]

মহারাজ লক্ষ্মী নারায়ণ (১৫৮৭ খ্রী : — ১৬২৭ খ্রী :) :

মহারাজ লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব কালের শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীশ্রী শঙ্কর দেবের শিষ্য মাধব দেব । তিনি সাহিত্য সাধনায় এবং এ রাজ্যে ধর্ম প্রচারে রাজ অনুকূল্য লাভ করে ছিলেন ।

মাধব দেবের বিশিষ্ট রচনাবলীর একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো : —

১। ভক্তি রত্নাবলী — অসমীয়া পুঁথি নং ১ — উঃ বঃ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ।

২। রামায়ণ - আদিকাণ্ড " " ১২ — "

৩। শ্রীকৃষ্ণ — জন্মরহস্য - " " ১৫ — "

৪। নাম মালিকা — পুরুষোত্তম গজপতি কর্তৃক সংস্কৃতে রচিত " নাম মালিকা" গ্রন্থের অনুবাদ । এটি রাজকন্যা বিধুপ্রভা কার্য়ীর অনুরোধে রচিত হয় । [৫২]

৫। নামঘোষা — এটিই - তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা । ভক্তিরসাশ্রিত পদগুলিতে কবির আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে ।

৬। বরগীত — শ্রী শঙ্করদেবের অনুসরণে মাধবদেবও অনেকগুলি বরগীত রচনা করেন । এই গীতগুলিতে ' দাস্য ' ও ' বাৎসল্য ' রসেরই সমধিক প্রকাশ ঘটেছে ।

গুরুর অনুসরণে তিনি কয়েকটি নাট এবং ভাগবত — ' ১০ম ' স্কন্ধ অবলম্বনে ' রাজসূয় ' নামে একটি আখ্যান কাব্য রচনা করেছিলেন ।

মাধবদেব ছাড়া এসময়ের উল্লেখযোগ্য কবি বলতে —

গোবিন্দ মিশ্র — কৃষ্ণগীতা — (একটি পুঁথি কোচবিহার 'সাহিত্য সভা'য় রক্ষিত)।

(অসমীয়া পুঁথি নং — ৩ এ শুধু 'গীতা' কথাটি লেখা আছে ।)

পুরুষোত্তম ঠাকুর — নাম ঘোষা ।

ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে ইনি শ্রীশঙ্করদেবের পৌত্র । ভেলাডাঙা - সত্রে (কোচবিহার) ইনি বাস করতেন । [অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা - পৃঃ ১৬৬]

গোপাল চরণ দ্বিজ — কোচবিহারের বৈকুণ্ঠপুরে দামোদর দেবের সত্রে থাকাকালীন ইনি ভাগবত (তৃতীয় ও অষ্টম স্কন্ধের অংশবিশেষের অনুবাদ , হরিবংশের অংশ বিশেষের অনুবাদ এবং ভক্তিরত্নাকরের 'ভাঙনি' রচনা করেন ।

মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি কৌমুদী গ্রন্থও

(শিবরাত্রি কৌমুদী , ফতদীক্ষা কৌমুদী ও প্রভৃতি) রচিত হয়েছিল ।
(কোচবিহারের ইতিহাস - ১ম খণ্ড পৃ : ১৫২)

<u>মহারাজ বীর নারায়ণ</u> : (১৬২৭ খ্রী : — ১৬৩২ খ্রী :) —

মহারাজ বীর নারায়ণের রাজত্ব কালে কবি শেখর মহাভারতের বনপর্বের অংশ পবিশেষ অনুবাদ করেন । উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১০ নং পুঁথিটির পাটায় " মহাভারত — কিরাত পর্ব " লেখা আছে । কিন্তু আদ্যন্ত পাঠ করলে পুঁথিটিকে কোনো প্রকারেই এ যেই কিরাত পর্ব বলা যায় না । কবি নিজেও কোথাও বলেননি যে তিনি ' কিরাত পর্ব ' রচনা করেছেন । ভণিতায় বলা হয়েছে -

" সিন্ধু শশ্ব বাণ বিধু শকের সময় ।
ফক্কত দেব দিন - করের উদয় ।।
গুরু দিনমা শুক্লাংশ্যি শশ পরধান ।
কাননে কুসুম কর্ম করিল প্রস্থান ।।
* * * *
ভূপ ভূপ বির নারায়ণ নরেশ্বরে ।
যদি ভূপ নরতনু বিহার নগরে ।।
ভবানন্দ নামে চন্দ্র সেনের নন্দন ।
নিজ ধর্ম্মে রত নিজ কুলের মণ্ডন ।।
যেন মহাশয়ের তনয় আশ্রমাতি ।
বোলো রাম কৃষ্ণ কবি শেখর বদতি ।। (পৃ : ১ — ২ ক)

এ থেকে কবির পিতৃ পরিচয় এবং পৃষ্ঠ পোষকের নাম জানা যায় । কাব্য রচনা কাল ১৫২৭ শক বা ১৬০৫ খ্রী: । কালজ্ঞাপক শ্লোকটি সম্ভবত হবে —' বেদ বান বান বিধু ' বা 'গ্রহবেদ বান বিধু ' তাহলে ১৫৫৪ বা ১৫৪৯ শক পাওয়া যায় । বীর নারায়ণ মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করে ছিলেন । তাঁর রাজত্ব কালে রচিত আর কোনো পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় নি ।

মহারাজ প্রাণ নারায়ণ : (১৬৩২ খ্রী : —— ১৬৬৫ খ্রী :) :—

মহারাজ প্রাণ নারায়ণের রাজত্ব কালে সাহিত্য সংস্কৃতির সবিশেষ উন্নতি ঘটে। তাঁর পৃষ্ঠপোষণায় —

১। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারত — আদিপর্ব (পুঁথি নং ৭৭) এবং মহাভারত — দ্রোণ পর্বের (পুঁথি নং ৮৫) অংশ বিশেষ অনুবাদ করেন। এ ছাড়া মহাভারত - আদিপর্ব অবলম্বনে রচিত 'দ্রৌপদী স্বয়ম্বরের' কয়েকটি পুঁথিও (নং ৭৮, ৮৩, ৮৭) রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে (উত্তর বঙ্গ, কোচবিহার) আছে।

২। দ্বিজ কবিরাজও সম্ভবত মহারাজ প্রাণ নারায়ণের আদেশে মহাভারতের 'গদা পর্ব' এবং 'সৌপ্তিক পর্ব' অনুবাদে ব্রতী হয়ে ছিলেন। নীচের ভণিতা দুটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য —[৫০]

(ক) আছিলন্ত পিতৃতার সর্বগুণ আধার
প্রাণ নারায়ণ নর রায়।
তনি আজ্ঞা শিরমালে দ্বিজ কবিরাজ ভণে
গদাপর্ব সুদেশ ভাষায়।।

(খ) তোমার পিতৃর প্রাণ - ভূপের আজ্ঞায়।
ভণিল সৌপ্তিক পর্ব পদক ভাষায়।।

'দ্রোণ পর্ব', 'গদাপর্ব' এবং 'সৌপ্তিক' পর্বের পুঁথি উত্তর বঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ে আছে। শ্রীনাথ কৃত দ্রোণপর্বের পরবর্তী অংশ দ্বিজ কবিরাজের দ্বারা অনূদিত। 'কোচবিহারের ইতিহাস' থেকে জানা যায় — পৃ: ১৬৩ — ১৬৪)
" মহারাজ প্রাণ নারায়ণের আজ্ঞায় কবিরত্ন 'রাজধর্মচন্দ্র' নামক রাজ বংশের একখণ্ড ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া ছিলেন। শ্রীনাথ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 'বিশ্বসিংহ চরিতম্' কাব্যের একখানি অসম্পূর্ণ হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। - - - - - - - এই সময়ে দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ এবং কৃষ্ণমিশ্র 'প্রহ্লাদ - চরিত' রচনা করিয়া ছিলেন। বিশারদ কবি কর্তৃক বিরাটপর্ব এবং কর্ণপর্ব অনুবাদিত হইয়াছিল। দামোদর - চরিত অবলম্বনে

লিখিত 'পুত্র লীলা'র রচয়িতা রামরাম সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ------ তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত জগন্নাথ 'প্রাণাভিরণম্' কাব্য রচনা করিয়া ছিলেন। জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহারাজ প্রাণ নারায়ণের আদেশে 'প্রয়োগ - রত্নমালা' ব্যাকরণের 'প্রভা - প্রকাশিকা' টীকা রচনা করিয়া ছিলেন।"

<u>মহারাজ মোদ নারায়ণ</u> (১৬৬৫ খ্রী : — ১৬৮০ খ্রী :) :—

মহারাজ মোদ নারায়ণের রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি দ্বিজ কবিরাজের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। দ্বিজ কবিরাজ পিতা-পুত্র (মহারাজ প্রাণ নারায়ণ ও মোদ নারায়ণ) উভয়েরই পৃষ্ঠপোষণা লাভ করেছিলেন। মহারাজ প্রাণ নারায়ণের পৃষ্ঠপোষণায় তিনি 'দ্রোণ পর্বের' অংশ বিশেষ (অর্থাৎ শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ যতদূর পর্যন্ত করে ছিলেন তার পরবর্তী অংশ) অনুবাদ করেন। কিন্তু ৬৫ নং ও ২৭ নং পুঁথিদ্বয়ের পাঠায় দ্বিজ কবিরাজ ও শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ উভয়েরই নাম আছে। তবে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ সম্ভবত: মহারাজ মোদ নারায়ণের সময়ে ছিলেন না।

দ্বিজ কবিরাজের আর একটি পুঁথিকে (নং ৬৬) "ভীষ্ম পর্ব" নামে চিহ্নিত করে উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পুথশালায় রাখা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটি 'উদ্যোগ পর্ব'।

'A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts' -

-এর পরিশিষ্টাংশে অসমীয়া পুঁথির তালিকায় 'সুবর্ণ ঘাটিকা পদ' নামে যে পুঁথিটি (নং ১) আছে, সেটি প্রকৃত পক্ষে বাংলা পুঁথি। এর প্রকৃত নাম 'সুবর্ণ মোটকী পদ'। ৬১৭ পৃষ্ঠার ভণিতায় পৃষ্ঠপোষক এবং কবি উভয়েরই নাম পাওয়া যায় —

> জয় জয় মোহারাজ মোদ নারায়ণ।
> দু:খিতের কল্পতরু সর্জ্জন রঞ্জন।।
> তাহার দেশত এক জদুমণি নাম।
> করজোড়ে সমস্তকে করযো প্রণাম।।

কবি অবশ্য 'মোটকী' স্থানে 'ঘুটিকা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

দুর্বাসার অভিশাপে 'উর্বশী'র ঘোটকীরূপে মর্তে আগমনের কাহিনী অবলম্বনে এই আখ্যান - কাব্যটি রচিত হয়েছে ।

মহারাজ মহীন্দ্র নারায়ণ – (১৬৮২ খ্রী: — ১৬৯৩ খ্রী:) :—

মহারাজ মহীন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে দ্বিজ রাম সরস্বতী মহাভারত - ভীষ্ম পর্ব অনুবাদ করেন (পুঁথি নং ১৪) । কিন্তু পুঁথি নং ১৫ - ও 'ভীষ্মপর্ব' নামে চিহ্নিত এবং রচয়িতার নাম দ্বিজ রঘুরাম এবং রাম সরস্বতী । দ্বিজ রঘুরাম হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালের কবি , আর দ্বিজ রাম সরস্বতীর পৃষ্ঠপোষক মহারাজ মহীন্দ্র নারায়ণ । উভয়ের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় একশ বছর । তবে ইনি মহারাজ নর নারায়ণের রাজত্বকালের কবি রাম সরস্বতীও নন । কারণ সেক্ষেত্রে ব্যবধান শত বর্ষাধিক ।

মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণ - (১৭১৪ খ্রী : — ১৭৬৩ খ্রী :) :—

মহারাজ মহীন্দ্র নারায়ণের পর সিংহাসনে বসেন মহারাজ রূপ নারায়ণ । তাঁর রাজত্বকালে ঘুরুন আক্রমণ তীব্রতর হয় । সম্ভবত : রাজনৈতিক দুর্যোগের ফলে রাজ্যে সাহিত্য চর্চা বিঘ্নিত হয়েছিল । রূপ নারায়ণের পর রাজত্ব করেন মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণ । তাঁর রাজত্ব কালে —

১। দ্বিজ নারায়ণ 'নারদীয় পুরাণ' অনুবাদ করেন । এর একটি পুঁথি (নং ৬) উঃ বঃ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে আছে ।

২। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ 'মহাভারত - বিরাট পর্ব' অনুবাদ করেন । বিরাট পর্বের একটি পুঁথি কোচবিহার সাহিত্য সভা গ্রন্থাগারে এবং আর একটি পুঁথি উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে । এই শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহারাজ প্রাণ নারায়ণের সভা কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ নন ।

<u>মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ</u> (১৭৮৩ খ্রী: — ১৮৩৯ খ্রী:) :—

মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণের পর থেকে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, প্রাসাদ - ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বহিরাক্রমণ ইত্যাদির ফলে রাজনৈতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ফলে সাহিত্য চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্ব কালে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে পুনরায় পূর্ণোদ্যমে সাহিত্য - সাধনা শুরু হয়। হরেন্দ্র নারায়ণ স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে। অতএব ১৮০০ — ১৮৩৯ খ্রী: কোচবিহারের সভা-সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যে সম্ভার বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছে। নীচে প্রদত্ত তালিকা থেকেই তা অনুমান করা যায়।

আগেও বলেছি এবং আবার বলছি, এখানে পুঁথি নং বলতে ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত-কৃত 'A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts Preserved in the State Library of Cooch Behar" তালিকা গ্রন্থে প্রদত্ত পুঁথি নং বোঝাবে। এই পুঁথিগুলি বর্তমানে উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে আছে। যে সব পুঁথি সাহিত্য সভা গ্রন্থাগারে বা উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে সেগুলোর পুঁথি নং উল্লেখ না করে গ্রন্থাগারের উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পুঁথির নাম	পুঁথি নং	রচয়িতার নাম
	<u>রা মা য় ণ :</u>		
১।	সুন্দর কাণ্ড	৬০, ৬৫	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।

পুঁথি দুটির মধ্যে পাঠ ভেদ আছে। দ্বিতীয়ত পুঁথিটি 'সাহিত্য সভা' থেকে শ্রী শরচ্চন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	পুঁথির নাম	পুঁথি নং	রচয়িতার নাম
২।	লঙ্কা - কাণ্ড	৬২, ৬৮ ক	দ্বিজ ব্রজ সুন্দর।
৩।	উত্তর কাণ্ড	৬৩	সারদানন্দ, শতানন্দ, রঘুরাম।
৪।	আরণ্য কাণ্ড	৬৪	বুদ্ধদেব শর্মা।
৫।	কিষ্কিন্ধ্যা - কাণ্ড	৬৭, ৬৮	দেবীনন্দন, শ্রীনাথ দ্বিজ, দ্বিজ রঘুরাম।
৬।	অযোধ্যাকাণ্ড	৬৬	রঘুরাম।

ক্রমিক নং	পুঁথির নাম	পুঁথি নং	রচয়িতার নাম
	ম হা ভা র ত:		
১।	বনপর্ব (নলদময়ন্তী উপাখ্যান)	৬৯	রাম নারায়ণ।
২।	প্রস্থানিক পর্ব	৭০	মহীনাথ।
৩।	মৌষল পর্ব	৭১	দ্বিজ বৈদ্যনাথ।
৪।	স্বর্গারোহণ পর্ব	৭২	মাধব চন্দ্র।
৫।	ঐষিক - পর্ব	৭৩	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।
৬।	কর্ণ পর্ব	৭৪	মনোহর দাস।
৭।	গদা পর্ব	৭৫	দ্বিজ রাম নন্দন।
৮।	সভা পর্ব	৭৬	জয়দেব, মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ, দ্বিজ ব্রজসুন্দর।
৯।	কর্ণ পর্ব	৭৯, ৮২	দ্বিজ নবীরাম।
১০।	শল্য পর্ব	৮০	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।
১১।	ভীষ্ম পর্ব	৮১, ৯৩	দ্বিজ রঘুরাম।
১২।	শান্তি পর্ব	৮৩	দ্বিজ রঘুরাম।
১৩।	আশ্রমিক পর্ব	৮৪	দ্বিজ কীর্তিচন্দ্র।
১৪।	শল্য পর্বের গদাযুদ্ধ	৮৮	দ্বিজ রামনন্দন।
১৫।	অশ্বমেধ পর্ব	৯১	দ্বিজ মহীনাথ।
১৬।	আদি পর্ব	৯২	দ্বিজ রুদ্রদেব।
১৭।	শান্তি পর্ব	৯৬	দ্বিজ বৈদ্যনাথ।
১৮।	বন পর্ব	৯৮	দ্বিজ পরমানন্দ।
১৯।	বন পর্ব	৯৯	দ্বিজ বৈদ্যনাথ, মহীনাথ, পরমানন্দ, রঘুরাম, বলরাম দ্বিজ এবং রামনাথ।
২০।	বন পর্ব	১০০	দ্বিজ বলরাম।
২১।	বন পর্ব	১০১	দ্বিজ বৈদ্যনাথ।
২২।	শান্তি পর্ব - প্রেত উপাখ্যান (সাহিত্য-সভা গ্রন্থাগারে আছে।)	—	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।

ক্রমিক নং	পুঁথির নাম	পুঁথি নং	রচয়িতার নাম

পু রা ণ :

১।	ভাগবত (ষষ্ঠ স্কন্ধ)	১০	দ্বিজ জগন্নাথ।

(পুঁথির ৩৪। ক পৃষ্ঠার ভণিতা দেখে মনে হয় এটি মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে শুরু হয়ে শিবেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বে শেষ হয়েছে।)

২।	বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (মধ্যখণ্ড)	২	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।
৩।	নৃসিংহ পুরাণ	৭	দ্বিজরাম নন্দন ও দ্বিজ ব্রজ সুন্দর।
৪।	ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড)	১২	বৈদ্যনাথ।
৫।	বিষ্ণু পুরাণ	২১	মাধব চন্দ্র [illegible] শর্মা।
৬।	বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (উত্তর খণ্ড)	২২	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।
৭।	স্কন্দপুরাণ (ব্রহ্মোত্তর খণ্ড)	২৩	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।
৮।	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড)	৫৬	বিপ্রদাস।
৯।	ধর্ম পুরাণ	৫৭, ৫৭ক	রামনন্দন।
১০।	গরুড় পুরাণ	৩	অজ্ঞাত।

(পুঁথিতে কালজ্ঞাপক ~~xx~~ শ্লোক এবং লিপিকরের নাম (মনিরাম দাস) আছে। রচয়িতার নাম নেই।)

বিবিধ বিষয়ক :

১।	ষড় ঋতু বর্ণন	১	দ্বিজভূত নাথ।

(মহাকবি কালিদাসের 'ঋতু সংহার' - এর সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ।)

২।	উপকথা	৬	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।

~~xx~~ (এটি শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত।)

৩।	রাজপুত উপাখ্যান	১১	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত।)

ক্রমিক নং	পুঁথির নাম	পুঁথি নং	রচয়িতার নাম
৪।	হিতোপদেশ (সংস্কৃত হিতোপদেশের গল্প গুলির পদ্যছন্দ ভাবানুবাদ।)	১, ২৪	দ্বিজ ব্রজ সুন্দর।
৫।	ক্রিয়াযোগ সার (শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিত।)	২০	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।
৬।	কাশী খণ্ড (সংস্কৃত 'কাশীখণ্ড' গ্রন্থের অনুবাদ।)	২৫	সারদানন্দ দাস
৭।	সাংখ্য প্রবচন সূত্র (শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত।)		মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।
৮।	গীতাবলী (শ্রী শরৎচন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত এবং কোচবিহার সাহিত্য সভা থেকে প্রকাশিত (১৩২৭ সন)।)	-	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ।
৯।	গোসানী মঙ্গল (ড: নৃপেন্দ্র নাথ পাল কর্তৃক পুন: সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ১৩০৫ সালে গোসানীমারী স্কুলের হেড পণ্ডিত ব্রজ চন্দ্র মজুমদার 'গোসানী মঙ্গল' কাব্য সম্পাদিত ও প্রকাশিত করেছিলেন।)	-	রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী।

মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণ — (১৮৩৯ খ্রী: — ১৮৪৭ খ্রী:):—

মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণও পিতার মতই সাহিত্য সেবী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীত রচনায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তাঁর রাজত্ব কালের উল্লেখ যোগ্য রচনাবলী —

১। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (পুঁথি নং ১৪) — দ্বিজ মহীনাথ শর্মা রচিত।

২। চণ্ডিকার ব্রতকথা (পুঁথি নং ২১) — মাধব চন্দ্র।

৩। শিব পুরাণ - (পুঁথি নং ৫৪) — দ্বিজ বৈদ্য নাথ।

৪। রাজ বংশাবলী -(পুঁথি নং ৪) — রিপুঞ্জয় দাস।

(সম্প্রতি এটি মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত।)

৫। রাজোপাখ্যান — মুন্সী জয়নাথ ঘোষ।

এটিও সম্প্রতি মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত।

৬। 'মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গীত সংগ্রহ — মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণ।

(শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত এবং কোচবিহার সাহিত্য সভা থেকে প্রকাশিত।)

মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কোচবিহারে মধ্যযুগীয় সাহিত্য রচনার ধারা অবলুপ্ত। এর পর মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্ব কালে (১৮৬৩ — ১৯১১ খ্রী:) আধুনিক সাহিত্য-এর অতিশীর্ণ একটি ধারার উদ্ভব ঘটে। এই উভয় কালের মধ্যবর্তী পর্বে রচিত হয় মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রাণী বৃন্দেশ্বরীর 'বেহারোদন্ত' কাব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সময় থেকে রাজ্যে এবং বিশেষভাবে রাজ পরিবারে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সাহিত্য প্রতিভা না থাকলেও তাঁর —

(১) Shooting in Cooch Behar এবং
(২) Thirty seven years of Big Game Hunting

নামে 'ডায়েরী ধর্মী' রচনায় ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের এবং রচনা কুশলতার পরিচয় রয়েছে। দুটি গ্রন্থই বর্তমানে উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে আছে। তাছাড়া মহারাজের পুত্র (মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণ), পুত্রবধূ (নিরুপমাদেবী; ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী) এবং মহিষী মহারাণী সুনীতি দেবী — সকলেরই সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিভা ছিল। এঁদের রচনাবলী প্রকাশিত হয় মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণের (১৯১৩ — ১৯২২ খ্রী:) এবং সর্বশেষ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের (১৯২২ খ্রী: — ১৯৪৯ খ্রী:) রাজত্ব কালে। এঁদের রচনাবলীর একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো। এগুলো সবই মুদ্রিত।

(ক) মহারাণী সুনীতিদেবীর রচনাবলী —

১। অমৃত বিন্দু (১ম ও ২য় খণ্ড)

২। কথকতার গান

* ৩। ঝড়ের দোলা

এটি চারটি ছোট গল্পের সংকলন। এর প্রথম গল্পটি ('দলন') সুনীতি দেবীর রচনা।

৪। সাহানা (গদ্য - পদ্য) রচনা সংকলন।)

৫। শিশু কেশব।

৬। শিব নাথ।

৭। সতী (গীতি নাট্য)

সুনীতিদেবী ইংরাজী - ভাষায় অনেকগুলো বই লেখেন। এগুলোর মধ্যে তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনা — " The Autobiography of an Indian Princess" - সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজী ভাষায় তাঁর অন্যান্য রচনা —

The Rajput Princess, Nine Ideal Indian Women, The Beautiful Mogul Princess, The Life of Princess Yashodara, The Bengal Dacoits and Tigers ইত্যাদি। এই রচনাবলীর অধিকাংশই প্রকাশিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে। মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণও ইংরেজী ভাষায় দুটি কাব্য এবং একটি নাটক রচনা করেছিলেন। কাব্য গ্রন্থ দুখানি দুটির নাম —

(a) 28th of February, (b) 4th of May.

কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকায় (নবপর্যায়, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৬ সাল) কাব্যগ্রন্থ দুটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন শ্রী অম্লানজ্যোতি মজুমদার।

জিতেন্দ্র নারায়ণের অপর রচনা -

Hello Darjeeling - An original Revue produced at Darjeeling, October, 1914.

(এটি Thacker Spink and Co. - প্রকাশ করেছিলেন।)

মহারাণী সুনীতিদেবীর পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম পাওয়া যাচ্ছে —

(ক) ধূপ (খ) গোধূলি ।

উপরিউক্ত রচনাবলীর কয়েকটি রয়েছে কোচবিহার উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে, কয়েকটি রয়েছে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এবং কিছু আছে অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে । এগুলোর মধ্যে সামান্য কয়েকটি রচনা দেখার সুযোগ হয়েছে । এ-সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি ।

কোচরাজ্যে সাহিত্য সাধনার কালসীমা ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ দশক পর্যন্ত । প্রায় চার শতক ধরে রচিত এই সাহিত্যকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করতে পারি । প্রথমটি পর্বটির রচনাকাল ষোড়শ থেকে মধ্যঊনিশ । আর দ্বিতীয়টির ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রায় রাজ্যের অন্তিম কাল পর্যন্ত । কোচরাজ্যে সাহিত্য সাধনার ধারা মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন থাকলেও মধ্য ঊনিশে এসে তা সুস্পষ্ট ভাবে বাঁক ফিরেছিল । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তৃতাকারে আলোচিত হয়েছে ।

উল্লিখিত সাহিত্য সম্ভারকে বিষয়ানুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে দেখানো যেতে পারে । যেমন —

<u>অনুবাদ সাহিত্য</u> :

রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত সহ বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণাদির পদ্যছন্দে সারানুবাদ । প্রাচুর্যের দিক থেকে এটিই প্রধান ।

<u>মঙ্গল কাব্য</u> :

মনসা মঙ্গল । তবে মঙ্গলকাব্যের ধারা সৃষ্টি হয়নি ।

<u>আখ্যান কাব্য</u> :

পুরাণাদি অবলম্বনে রচিত । প্রাচুর্যের বিচারে এটি দ্বিতীয়স্থানাধিকারী ।

<u>বৈষ্ণব পদ</u> : বরগীত ।

<u>প্রশস্তিপদ</u> : ভটিমা ।

<u>নাট</u> :

পদ্য - গদ্য মিশ্রিত রচনা ।

<u>উপকথা</u> :

মাত্র দুটি ।

<u>শক্তি গীতি</u> :

প্রাচুর্য না থাকলেও উৎকর্ষ বর্জিত নয় ।

<u>গীতি কবিতা</u> :

দ্বিতীয় পর্বে রচিত ।

<u>ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য</u> :

বেহারোদ্দিত ।

<u>বিবিধ বিষয়ক রচনা</u> :

ছোট গল্প , গান , গীতিনাট্য , ইংরেজী কাব্য ও নাটক , ব্রতকথা , পাঁচালী ইত্যাদি।

<u>মননশীল রচনা বলী</u> :

সংস্কৃতে লেখা বিবিধ কৌমুদী গ্রন্থ , ব্যাকরণ , প্রভৃতি ।

<u>রাজ বংশের বিবরণ</u> :

রাজোপাখ্যান , বংশাবলী প্রভৃতি । এগুলো গদ্যে রচিত ।

প্রধানত : কাব্য - সাহিত্য বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে বলে অন্যান্য রচনাবলীর বিশদ বিবরণ কিছু দেয়া হয়নি ।

প্রদত্ত বিবরণই শেষ নয় , সবতো নয়ই । অজিও অসংখ্য এবং বিচিত্র রচনা রয়ে গেছে পাঁচালী - ব্রতকথা - গাথা বা পালগান ইত্যাদির আকারে । রাজসভার বাইরে থেকে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন (মধ্য বা আধুনিক যুগে) তাঁদের সৃষ্টি এখনও অজ্ঞাতই আছে ।

বর্তমান গবেষণাটি প্রধানত : পুঁথি নির্ভর হলেও অনেক সময়ই মুদ্রিত রচনাবলীর উপর নির্ভর করতে হয়েছে । সেক্ষেত্রে সম্পাদক কতটা পরিবর্তন করেছেন তা বিচার

করা সম্ভব হয়নি। রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য সম্ভারের সুবৃহৎ অংশ এখনো পুঁথির আকারেই রয়েছে। কবি বা রচয়িতার স্বহস্ত লিখিত পুঁথি নেই বললেই চলে। কোনো কোনো পুঁথিতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায় —— আবার অনেক পুঁথিতে তাও নেই। কোনো কোনো রচনার একাধিক পুঁথি অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি আছে এবং তাতে পাঠভেদও দুর্লভ নয়। তবে রাজকীয় প্রচেষ্টায় সংরক্ষিত এবং আঞ্চলিকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকায় পুঁথিগুলির প্রক্ষেপ - নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তেমন ছিল বলেই মনে করা যেতে পারে।

কবি এবং তাঁর কাব্যের রচনাকাল নির্ণীত হয়েছে কখনো পুষ্পিকা বিচার করে, কখনো পৃষ্ঠপোষকের প্রশস্তি থেকে কখনো বা অন্য কোনো তথ্য বিচার করে। 'ভাষা' কিংবা 'লিপি' বিচার করে কালনির্ণয়ের কোনো প্রয়াসই নেয়া হয়নি।

প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখ পঞ্জী :

১। The Tribes and Castes of Bengal 4 Vol-I p. 492
(Reprint. Cal. 1981)
by
Herbert Risley

২। বাঙালীর ইতিহাস - আদিপর্ব - ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ) পৃঃ ৩২ - ৩৬
ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

৩। ———— ঐ ———— পৃঃ ৫০

৪। Kirata - Jana - Krti (Revised Edition-1974) pp. 41 - 47
Dr. Sunity Kumar Chatterjee

৫। Linguistic Survey of India Vol.III.part-II p. 95

by

Grierson

৬। Kirata - Jana - Krti (Revised Edition-1974) p. 112

৭। In Search of Identity -- The Mech (1st Edition 1985) p. 47

by

Mr. Hira Charan Narjinari

৮। কোচবিহারের ইতিহাস - প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪

খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ

৯। Kirata - Jana - Krti(Revised Edition-1974) p. 113

১০। The Koch Kings of Kamarupa (J.A.S.B.1893) p. 26

by

E.A. Gait Esq. I.C.S.

১১। কোচবিহারের ইতিহাস - প্রথম খণ্ড পৃঃ ৬০

খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ

১২। A History of Mughal North - East Frontier Policy - (1929) p. 76

by

Dr. Sudhindra Nath Bhattacharjee.

১৩। কোচবিহারের ইতিহাস — প্রথম খণ্ড পৃঃ ২

খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ

১৪। " কামরূপী উপভাষা : ধ্বনি ও রূপ বিচার" পৃঃ ৫৬১

ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ।

[সুবর্ণ লেখা (সংস্কৃত বৃত্ত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত]

১৫। ভারত কোষ, প্রথম খণ্ড - (ড: সুকুমার সেন) পৃঃ ৬৪
(ড: অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপরিউক্ত প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।)

১৬। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) - ১ম খণ্ড (৩য় সং) পৃঃ ৫৩
ড: নীহার রঞ্জন রায়

১৭। Kirata - Jana - Krti (Revised Edition-1974) p. 39

১৮। The Origin And Development of
The Bengali Language (ODBL) by p. 79
Dr. Sunity Kumar Chatterjee
(Rupa Hardbook Impression, 1985)

১৯। --------- ঐ --------- p.139

২০। --------- ঐ --------- p.141

২১। --------- ঐ --------- p.117

২২। সাহিত্য সন্ধান (সমতুলী উপভাষা ও বাংলা গদ্যভাষা) পৃঃ ১৬০
ড: অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

২৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - ১ম খণ্ড (৪র্থ সং - ১৩৮২) পৃঃ ৩০০
ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ১ম খণ্ড - পূর্বার্ধ
(৬ ষ্ঠ সং - ১৩৭৮) পৃঃ ১৪১
ড: সুকুমার সেন

২৫। Early History of Kamarupa
(2nd Edition - 1966) p.165
Rai K.L. Barua Bahadur.

২৬। Literature in Kamata Koch Raj Darbar. p. 31
Dr. Ajoy Kumar Chakraborty

২৭। O D B L (Rupa Hardbook Impression-1985)
-Vol. I p.108
Dr. S.K. Chatterjee.

২৮। Assamese - Its Formation and Development
(Revised Edition)
Dr. B.K.Kakati - গ্রন্থের ৭ - ৮ পৃঃ থেকে উৎকলিত।

২৯। অসমীয়া সাহিত্যর ইতিবৃত্ত (৭-ম সংস্করণ) পৃঃ ৫৫
ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা

৩০। ------ ঐ ------- পৃঃ ৫৭ - ৫৮

৩১। ------ ঐ ------- পৃঃ ৬০

৩২। O D B L -- Vol - I p.127-128
(Rupa Hardbook Impression- 1985)
Dr. S.K.Chatterjee.

৩৩। সাহিত্য সন্ধান (কামরূপী উপভাষা ও বাংলা গদ্যভাষা) পৃঃ ১৬৫
ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

৩৪। ধর্মপালের তাম্র শাসন - দ্বিতীয় ফলক - প্রথম পৃষ্ঠা
শ্রী পদ্মনাথ দেবশর্মা অনূদিত।
রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা - ১৩২২ সন, ২-য় সংখ্যা। পৃঃ ৮১

৩৫। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম প্রকাশ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১৬৭
ডঃ সেনগুপ্ত।

৩৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণ — (পীতাম্বর) - পুঁথি নং ৮ পৃ: ১।ক

৩৭। ——- - - - - - ঐ - - - - - - -—— পৃ: ১০।খ

৩৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ১ম খণ্ড - পূর্বার্ধ (৬ষ্ঠ সং) পৃ: ২৭০
ডঃ সুকুমার সেন।

৩৯। - - - - - - - ঐ - - - - - - - পৃ: ২৭১

৪০। Kirata-Jana-Krti (Revised Edition-1974) p. XIX

৪১। মনসা কাব্য — ১ম খণ্ড (মনকরী আৰু দুর্গাবরী) - ভূমিকা পৃ: ১
(ডঃ বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া এবং ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ
শর্মা সম্পাদিত)

৪২। অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা (৪র্থ সং) পৃ: ৬৮ - ৬৯
ডঃ মহেশ্বর নেওগ

৪৩। শ্রী শঙ্কর বাক্যামৃত, রত্ন ভটিমা পৃ: ৪ - ৫
শ্রীহরি নারায়ণ দত্ত বরুয়া, সাহিত্য রত্ন সম্পাদিত

৪৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ১ম খণ্ড - পূর্বার্ধ (৬ষ্ঠ সং) পৃ: ২৭২
ডঃ সুকুমার সেন।

৪৫। অসমীয়া সাহিত্যের রূপ রেখা (৪র্থ সং) পৃ: ১৪১
ডঃ মহেশ্বর নেওগ।

৪৬। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৭ম প্রকাশ) পৃ: ১০৪—১০৬
ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা।

৪৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ১ম খণ্ড - পূর্বার্ধ (৬ষ্ঠ সং) পৃ: ২৭৪
ডঃ সুকুমার সেন।

৪৮। কোচবিহারের ইতিহাস - ১ম খণ্ড - পৃঃ ১০১
খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহ্মদ।

৪৯। অসমীয়া সাহিত্যর ইতিবৃত্ত (৭ম প্রকাশ) পৃঃ ১০০

৫০। ------- ঐ ------- পৃঃ ১০৯

৫১। শ্রীমদ্ভাগবত - ৩য় সং - পৃঃ ১৮৭
(অসমীয়া)
(শ্রী হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া, সাহিত্য রত্ন, সম্পাদিত)

৫২। কোচবিহারের ইতিহাস — ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫২
খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহ্মদ

৫৩। (ক) পদ্মা পর্ব — দ্বিজ কবিরাজ
উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রক্ষিত পুঁথি পৃঃ ২৪।ক
(খ) ---- ঐ -------- পৃঃ ৩৬।ক

- ※ -